কিশোর গ্রন্থাবলী

= দ্বিতীয় খণ্ড =

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

কিশোর গ্রন্থাবলী

—দ্বিতীয় খণ্ড—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ছবি এঁকেছেন :
শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য
ব্লক করেছেন :
শ্রীহীরালাল সেনগুপ্ত
ষ্ট্যানডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
ছেপেছেন :
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি-এল্‌-রায় ষ্ট্রীট
কলিকাতা
প্রকাশ করেছেন :
শ্রীসরোজনাথ সরকার এম্‌-এ বি-এল্‌
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য পাঁচসিকা মাত্র



—এক—

খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল একটী খবর ঃ

হাজার টাকা পুরস্কার

আসামের সর্পদেবতা

গৌহাটীর একখানি আসামী পত্রিকায় সম্প্রতি একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী বাহির হইয়াছে। জনৈক বনরক্ষক সাহেবের একজন মুসলমান খানসামা ও একটি খাসিয়া ভৃত্য ছিল, দু'জনের বন্ধুত্ব ছিল খুব। একদিন বিকালে দু'জনে বেড়াইতে বাহির হইয়া বনের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূর চলিয়া যায়, ফিরিয়া আসিবার সময় তাহারা পথ হারাইয়া ফেলে, ফলে অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠিক পথ খুঁজিয়া পাইবার আগেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। আসামের জঙ্গলে রাত্রে হাতী ও চিতাবাঘের ভয় আছে, তার উপর সেদিন আবার অমাবস্যা, জ্যোৎস্নার আলোয় যে পথ খুঁজিয়া লইবার সুবিধা হইবে তাহাও নাই। অনেক কথা আলোচনা করিয়া শেষে দু'জনে একটি গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিবার মতলব করিতেছে—এমন সময়ে সহসা কোথা হইতে কয়েকজন লোক অতর্কিতে অন্ধকারে গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল।

এমনভাবে আক্রান্ত হইবার জন্য তাহারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না, হাতে

তাহাদের একগাছি করিয়া শুধু লাঠি ছিল, শত্রুরা অত্যন্ত সহজে তাহাদের বাঁধিয়া ফেলিল। খানসামাকে বাঁধিয়া রাখিয়া খাসিয়া চাকরটিকে তাহারা একটু তফাতে লইয়া গিয়া টাঙ্গি দিয়া তাহার নাক কাটিয়া ফেলিল। যন্ত্রণায় চাকরটি যখন আর্তনাদ করিতেছে সেই সময় তাহার নাকের ক্ষতস্থানের উপর একটি বোতলের মুখ চাপিয়া ধরিল। বোতলটি রক্তে ভরিয়া গেলে লোকটাকে ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা চলিয়া গেল। চাকরটি তখন বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে ঠিক বোঝা গেল না।

খানসামাটী এতক্ষণ শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল, লোকগুলির মশালের আলো অন্ধকারে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যাইতেই দাঁত দিয়া সে হাতের বাঁধন চিবাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন গড়াইতে গড়াইতে একদিকে খানিকটা সরিয়া গিয়া পাহাড়ের গায়ে একটা পাথরের খাঁজ খুঁজিয়া লইয়া তাহাতে ঘসিয়া ঘসিয়া সে হাতের বাঁধন কাটিয়া ফেলিল।

তারপর পায়ের বাঁধন খুলিতে আর কতক্ষণ লাগে।

বন্ধন মুক্ত হইয়া সে তাহার বন্ধুর কাছে ছুটিয়া আসিল। বন্ধুর দেহ তখন হিমশীতল হইয়া গিয়াছে, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে বুঝিবার উপায় নাই। কোন উপায় না দেখিয়া বন্ধুর দেহ কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া যে দিকে শত্রুরা গিয়াছে সেই দিকে চলিল। যাইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই খানিকটা আসিয়াই পায়ে-চলা একটা মেঠো পথ পাইল, সেই পথ দিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা অগ্রসর হইবার পর বনের মাঝেই সে একটু ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িল। অন্ধকারে ভাল করিয়া নজর করিয়া দেখিল একটা ছোট গ্রামের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে। একটি মানুষকে কাঁধে বহিয়া আনিবার জন্য পরিশ্রম তাহার বড় কম হয় নাই। সারা দেহ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। তৃষ্ণাও পাইয়াছিল খুব, অথচ কাহারও দরজায় ধাক্কা দিয়া যে আশ্রয় চাহিবে সেটুকু সাহসও তাহার ছিল না। যাহারা তাহার বন্ধুটিকে খুন করিবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই বাড়ীটা যদি তাহাদের কাহারও হয় তাহা হইলে ত আর রক্ষা নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে একটা গাছতলায় কাঁধের বোঝা নামাইয়া, সেখানে বসিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া লওয়াই সে স্থির করিল। দরকার কি অজানা অচেনা জায়-গায় কাহাকেও ডাকাডাকি করিয়া!

বসিয়া বসিয়া ঘুম পাইতেছিল।

মাঝে মাঝে এক একবার চাকরটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল তখনও তাহার জ্ঞান হইয়াছে কিনা, কিন্তু জ্ঞান হওয়া ত দূরের কথা লোকটি সেই যে হিম-শীতল হইয়া পড়িয়া আছে, দেহে এখন পর্যন্ত একটু উত্তাপও দেখা দেয় নাই। লোকটি কি তবে মরিয়া গেল নাকি ?

খানসামার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। সর্বনাশ…একটা মড়ার পাশে বসিয়া বসিয়া এই অমাবস্থার রাত্রি কাটাইতে হইবে! কিন্তু সত্যই ও মরিয়াছে কিনা তাহার সন্দেহ! নিঃশ্বাস বহিতেছে কি না নাকে হাত দিয়া যে দেখিবে তাহার উপায় নাই, নাকটা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে!

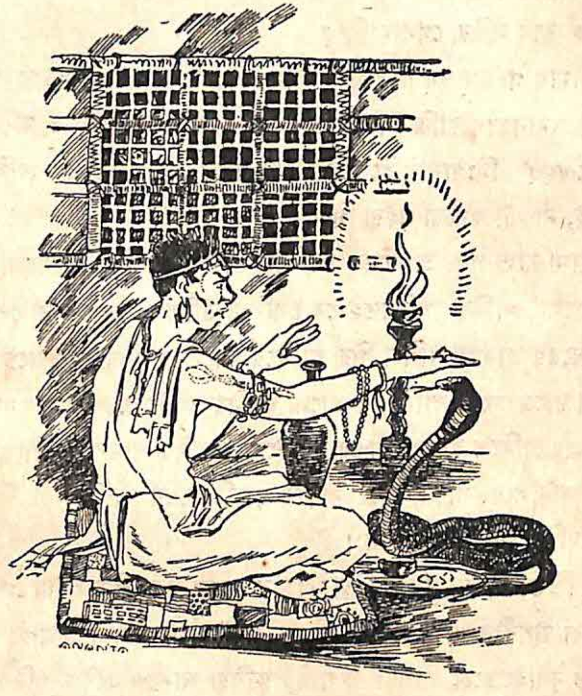
খানসামা সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে ঝিমাইতেছিল। সহসা মুখের উপর একটা আলো আসিয়া পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। তাকাইয়া দেখে ওদিকের একখানি ঘরের জানালা খুলিয়া গিয়া বাহিরে আলো আসিয়া পড়িয়াছে॥

এতো রাত্রে জংলী খাসিয়ারা আলো জ্বালিয়া করিতেছে কি ? যাক, উহাদের কাছে আশ্রয় চাহিলে হয়তো পাওয়া যাইবে, ভাবিয়া খানসামা ধীরে ধীরে উঠিয়া নিঃশব্দে জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ভিতরের বাসিন্দারা কি করিতেছে একবার দেখিয়া লইতে হইবে ত!

কিন্তু ভিতরের ব্যাপার দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। দেখিল ঃ ঘরের মধ্যে উপবীত-ধারী একজন ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘ কালো সাপের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছে, সাপটা ফণা উঁচু করিয়া আনন্দে এদিক ওদিক দুলিতেছে। ক্রমেই যেন সাপটা একটু একটু করিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। তাহার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ ক্রমে যেন গর্জনের মত শোনাইতে লাগিল। শেষে কতকক্ষণ পরে বাঁ হাতের কাছে যে বোতলটি এতক্ষণ পড়িয়াছিল, ব্রাহ্মণ সেটি সাপের মুখের কাছে ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে সাপটী বোতলের মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া দিয়া কি যেন খাইতে লাগিল। কি খাইতেছিল খানসামা তখন বোঝে নাই, বুঝিল সাপটী মুখ বাহির করিতে, সাপটীর মুখের অর্ধেক তখন রক্তে লাল হইয়া আছে। সাপটা তাহলে এতক্ষণ রক্ত পান করিতেছিল। খানসামাটির এবার মনে পড়িল, তাহার বন্ধুর নাক কাটিয়া ওইরূপ একটা বোতলে করিয়াই তো ইহারা রক্ত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—এ রক্ত কি তবে সেই রক্ত!

খানসামার মনে হইতে লাগিল হাঁটু দুটী যেন ঠক ঠক করিয়া পরস্পরের সঙ্গে

ঠোকাঠুকি লাগিতেছে, দেহের ভার সহিবার ক্ষমতা বুঝি আর পা দুটিতে নাই। কিন্তু এখন এতটুকু শব্দ হইলেই বিপদ,—জীবন মরণ সমস্যা! কোন রকমে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সে চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিল।



ওদিকে তখন বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে ব্রাহ্মণ সাপটীর কপালে সিঁদুর অথবা রক্তচন্দন লেপিয়া দিতেছিল। দেখিতে দেখিতে মন্ত্রের জোরেই হোক বা কোন ঔষধের গুণেই হোক সাপটী ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, শেষে ক্ষীণতম হইয়া একটা সরু দড়ির মত হইয়া পাশের একটা ছোট টিনের কৌটার মধ্যে গিয়া ঢুকিল। অতবড় একটা সাপ যে একটা এতটুকু কৌটার ধ্যেম থাকিতে পারে প্রত্যক্ষ না দেখিলে কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না—করিতে পারিবে না।

কৌটাটি তুলিয়া রাখিয়া এদিকে আসিয়া ব্রাহ্মণ জানালা বন্ধ করিয়া দিবার আগেই নিঃশব্দে সে সরিয়া পড়িল।

কি করিয়া যে সেই অসহায় অবস্থায় অন্ধকারে জঙ্গলের বুকে তাহার রাত্রি কাটিল তাহা সে-ই জানে।

ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুকে সে একবার ভাল করিয়া দেখিল, দেখিল সে বহুক্ষণ মরিয়া গিয়াছে। তখন কাছাকাছি একটা সর্বোচ্চ গাছে উঠিয়া সে পথ ঠিক করিয়া লইল, তারপর কাঁধে বন্ধুর মৃতদেহ লইয়া সে চলিল সাহেবের আস্তানার উদ্দেশে।

বনরক্ষক সাহেব সব শুনিয়া সেই রাত্রেই লোকজন লইয়া সেই গ্রাম ঘিরিয়া ফেলিয়া সর্প সমেত সপরিবারে ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করিলেন।

আদালতে বিচার চলিতেছে। ব্রাহ্মণ তাহার দোষ স্বীকার করিয়াছে। বিচারপতি এখনও রায় দেন নাই।

স্বীকারোক্তিতে ব্রাহ্মণটি বলিয়াছে যে ইহা শুধু তাহার একার ঘটনা নয়, পাহাড়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই ধরণের সর্পপূজা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রতি অমাবস্যায় একটি করিয়া খাসিয়ার রক্ত সর্প-দেবতাকে পান করাইতে হয়। এই জন্যই খাসিয়ারা বিশেষ প্রয়োজনেও সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহির হইতে চায় না। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে বহু গ্রামেই এই ধরণের সর্প-দেবতার সন্ধান পাইবেন। তবে অনুসন্ধান গোপনে করিতে হইবে, কেননা খাসিয়ারা এই সর্পপূজক ব্রাহ্মণদের মন্ত্র-তন্ত্রকে অত্যন্ত ভয় করে। বেশী কথা বলিতে কি, সর্প-দেবতার পূজার জন্য নিজেদের আত্মীয়ের বিনাশ ঘটিলেও ভয়ে তাহারা পুলিশকে জানাইতে চাহে না।

এই ধরণের নরহত্যাকে বন্ধ করিবার জন্য পুলিশের কর্তৃপক্ষ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। যিনি সর্পসহ একজন সর্পপূজককে ধরিয়া দিতে পারিবেন, কি সঠিক সন্ধান দিয়া পুলিশের সাহায্যে ধরাইয়া দিতে পারিবেন, তাহাকেই হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত একজন লোকও পুরস্কার লইতে অগ্রসর হয় নাই, আসামীরা কি তাহলে জানিয়া-শুনিয়াও এই কুপ্রথাকে সমর্থন করিতে চায়?

খবর পড়েই সবোজ লাফিয়ে উঠলো, বললো—বিনয়দা, এতদিনে করবার মত একটা কাজ পেয়েছি, আমি আসাম যাব।

—কি কাজ ?—সকলে অবাক হয়ে মুখের পানে তাকালো, কাগজের খবরটা তখনও কেউ পড়েনি।

—শুনুন তবে কি কাজ—বলে সরোজ খবরটা পড়ে শোনালো।

সনি বললো—হাজার টাকার জন্য কি শেষে আপনি আসামের জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবেন ?

—হাজার টাকাই শুধু দেখলে, কেমন এড্‌ভেঞ্চার হবে বল দেখি। বসে বসে চা খেয়ে, খবরের কাগজ পড়ে, বায়োস্কোপ দেখে বুড়ো হয়ে গেছি—বেঁচে আছি কি মরে গেছি তা বুঝতে পারছি না !

বিনয়বাবু বললেন—ঠিক কথা, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। এমন ভাবে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না।

সনি বললো—আমিও যাবো—

ডেভিড বললো—why not I ?

বিনয়বাবু বললেন—না, সকলের যাবার দরকার নাই, সনির কলেজ আছে, তার উপর সামনেই পরীক্ষা, ডেভিডের চাকরী ছেড়ে যাবার দরকার নাই। যাব আমি আর সরোজ।

বিনয়বাবুর কথার উপর আর কেহ কথা বলে না। তথাপি ডেভিড বললো—কিন্তু আপনারা যদি বিপদে পড়েন ?

—যদি সত্যি কোন বিপদে পড়ি তখন তোমাদের টেলিগ্রাম করবো, তোমরা যেও।

—যদি টেলিগ্রাম করবার কোন উপায় না থাকে ?

—লোক দিয়ে খবর পাঠাব সহরে। সে ব্যবস্থা ঠিক করবো, তোমরা কিছু ভেব না। আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে মানুষ-খেকোদের মধ্যে যে লোক স্বচ্ছন্দে দিনের পর দিন কাটিয়ে এসেছে সে কি আর আসামের জঙ্গলে ভয় পাবে ?

এ কথার পর আর কিছুই বলা চলে না।

কথায় আছে শুভস্য শীঘ্রং, বিনয়বাবু ও সরোজ আর দেরী করতে পারলো না, সেই দিনই লটবহর নিয়ে ট্রেণে চেপে বসলো।

—দুই—

কামরূপ চমৎকার জায়গা।

পাহাড়টীর বুকে অত্যন্ত সাধারণ একটী মন্দিরকে ঘিরে ছোট একটা সহর গড়ে উঠেছে। উঁচুনীচু পথের পাশে উপরে ও নীচে বাড়ীর সারি, আশ্রম আর পার্বত্য গাছ। শেষে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়া পথটী কোথায় নিরুদ্দেশের সন্ধানে ছুটে গিয়েছে, মাঝে মাঝে সেই পথ দিয়ে দু'চার জন পাহাড়িয়াকে আসতে কি যেতে দেখা যায়, বুঝা যায় জঙ্গলের ভিতরে পথটী বেঁচে আছে।

দুই বন্ধুতে এখানে এসে উঠেছে।

সরোজের ইচ্ছা এইখান থেকেই খোঁজ-খবর নিয়ে বাহির হবে। বিনয়বাবু তাতে আপত্তি করেন নাই।

প্রথমে কয়েকদিন তো কোন স্থবিধা হোল না। পুলিশের কাছ থেকে তো আর সন্ধান পাওয়া যাবে না। তারা জানলে তো নিজেরাই একটা কিছু ব্যবস্থা করতো। সন্ধান নিতে হবে এদেশী জংলীদের কাছ থেকে। তা'ও সহসা কেউ বলবে না, আলাপ জমাতে হবে, বকশিষ দিয়ে বশ করতে হবে।

সরোজ আর বিনয়বাবু তেমনি একজন লোকের সন্ধান করছিলেন। সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন একজন লোকের সন্ধান মিলে গেল।

বিকালবেলা দুই বন্ধুতে পাহাড়ের এক কিনারায় বসে দূরের পানে তাকিয়ে ছিলেন। দূরে ব্রহ্মপুত্র এঁকেবেঁকে সোনালি সূর্যের আলো গায়ে মেখে অনন্ত গতিতে পাহাড়ের কোল ঘেসে ছুটে চলেছে। চারিপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল পাহাড়ের সারি। নরম মাটির বুকে কঠিন পাথর জন্মেছে, জগতের বেদনা ও অত্যাচার সহে সহে আর সইতে না পেরে মাটীও বুঝি পাথর হয়ে গেছে! মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, জগতের অন্যায়কে বুঝি শাসন করতে চায়। আবার এই কঠিন পাথরের বুকেও রসের সন্ধান নিয়ে ঘাস জন্মেছে। গাছের সারি হাওয়ার দোলায় মাথা দুলিয়ে শাখা কাঁপিয়ে পাতার মর্মরধ্বনি তুলে জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। তারই পাশে পাশে চোখে পড়ছে দু'পাঁচখানি কুঁড়েঘর আর খানিক শ্যামল ধূসর ক্ষেত। কার্পেটের উপর বোনা ছবির মত সেই দৃশ্যকে দু'পাশে রেখে হুইশ্‌ল্ বাজিয়ে মাঝে মাঝে অজগর সাপের নিঃশ্বাসের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এঁকে-বেঁকে এক একখানি ট্রেণ ছুটে চলেছে, বিরাট স্তব্ধতার বুকে এক একবার বিরাম

ঘটছে। একদিকে প্রকৃতির সুদৃশ্য অখণ্ড স্তব্ধতা অরেকদিকে মানুষের হাতে-গড়া ফুঁশিয়া-উঠা গর্জিত রেলগাড়ী, দেখতে ভাল লাগে, চোখ ফিরাতে ইচ্ছা করে না।

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

বিনয়বাবু বললেন—দেখ সরোজ, এই ফাঁকে দু'এক দিনের মধ্যে ঐ দ্বীপটা একবার ঘুরে আসতে হবে।

বিনয়বাবু ব্রহ্মপুত্রের বুকে একটা দ্বীপ লক্ষ্য করে কথাটা বললেন।

সরোজ বললো—ও, ওই দ্বীপটীর ওখানে মন্দিরও আছে—উমানন্দ ভৈরব, বেশ জায়গা, আমারও যাবার জন্য লোভ হয়, চলুন-না কাল যাই। কিন্তু ওর এদিকে একটা কতবড় ঘূর্ণী রয়েছে দেখেছন? এখান থেকে কতবড় দেখাচ্ছে, আমার তো মনে হয় এক মাইলের কম নয়।

—ওর জন্য কিছু আটকাবে না বাবু, আপনারা যদি কাল দেখতে চান তো বলুন আমার নৌকা রয়েছে।

দু'জনে চমকে উঠলো—এতক্ষণ একটী লোক যে তাদের কথা শুনছে তারা দু'জনে টের পায়নি; মুখ ফিরিয়ে বিনয়বাবু দেখলেন: একজন সাধারণ মাঝি গোছের লোক, জিজ্ঞাসা করলেন—কতক্ষণ লাগবে ঘুরে ফিরে আসতে?

—ঘণ্টা সাত আট—সকালে বেরোলে সন্ধ্যায় ফিরে আসতে পারবেন বাবু—

—বেশ তাহলে কালই যাবো, কি বল সরোজ?

সরোজ বললো—বেশ?

—তাহলে আজ আপনাদের বাড়ীটা দেখিয়ে দিন বাবু, কাল সকালে ডেকে নিয়ে যাবো।

—বেশ চলো—বলে বিনয়বাবু উঠে জুতা পরতে লাগলেন; সরোজও উঠে দাঁড়ালো।

পথ চলতে চলতে মাঝি বললো—সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরবেন বাবু, এখানে বড্ড চিতার ভয়। তার উপর একটী হুজুগ উঠেছে বাবু, এখানকার একদল বামুন নাকি মানুষের রক্ত খাইয়ে সাপ পোষে। পশুর হাত থেকে বাঁচা যায় বাবু, কিন্তু মানুষের হাত থেকে বাঁচা শক্ত। এক সঙ্গে পাঁচ-দশ জন মানুষকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত বাবু!

—সত্যি ? এমন লোক এখানে আছে নাকি ? কই তাতো শুনিনি—সরোজ এমন ভাবে কথাগুলো বললো যেন সে কিছুই জানে না।

—আমিও তো শুনিনি বাবু, তবে ক'দিন ধরে শুনছি এমনি একটা সাপ-পূজা-করা বামুনকে নাকি পুলিশে ধরেছে।

লোকটা মুখে জানিনা বললেও সরোজের সন্দেহ হোল যে সে অনেক কিছু জানে কিন্তু তার কাছ থেকে আর কোন কথা জেনে নেবার আগেই মাঝি বাড়ী দেখে তাড়াতাড়ি বিদায় নিল। সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হয়ে ওঠার আগেই তাকে বাড়ী পৌছতে হবে। যাবার সময় সে বলে গেল—কাল সকাল আটটার সময় আসবো বাবু, তৈরী থাকবেন।

সকালে সবে স্নান শেষ করেছে এমন সময় মাঝি এসে হাজির, বললো—একটু আগেই এলুম বাবু, তাগিদ না দিলে তো দেরী করবেন সেই জন্য।

তখনও আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী আছে, তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে নিয়ে মাঝির সঙ্গে দু'জনে বাহির হয়ে পড়লো।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে আমিনগাঁর ঘাটে এসে সরোজ ও বিনয়বাবু নৌকা ধরলো। নৌকায় আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসেছিলেন। বেশ সুপুরুষ, জোরালো চেহারা, পাঞ্জাবীর ভিতর থেকে বুকের ছাতিটা বাহির হয়ে আসছে। বয়সও বেশী হয় নাই। প্রথম দৃষ্টিতে কেমন যেন আলাপ করতে ইচ্ছা করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমলো। তিনি কলিকাতার নাম করা ডাক্তার, অত কম বয়সেই চোখ সম্বন্ধে নূতন গবেষণা করে যথেষ্ট নাম করেছেন। তিনি নাকি জন্মান্ধেরও দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

সরোজ তো শুনেই অবাক, বললো—জন্মান্ধ যে, তার কি কখন চোখ হয় ?

—নিশ্চয়ই হয় ? আমি নিজে পরীক্ষা করে সফল হয়েছি। মেডিক্যাল কলেজের বড় বড় ডাক্তারদের চোখের সামনে দেখিয়েছি, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজে আমার সম্বন্ধে ছবি দিয়ে অনেক কথা লিখেছিল, তার কাটিংস্ আমার কাছে আছে আপনাদের দেখাব এখন।

—কেমন করে তা সম্ভব হয় ?

—ডাক্তার না হলে আপনারা তা ঠিক বুঝবেন না। তবে এইটুকু শুধু জেনে রাখুন যে, যে লোক জন্মান্ধ হয়ে জন্মেছে সে চোখে কিছুই দেখতে পায় না।

আর শত চেষ্টা করলেও সে চোখ কোন রকমে শোধরানো যায় না। তবে এমন যদি কোন লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যে চোখে দেখতে পেত তবে সম্প্রতি কোন কারণে চোখ খারাপ হয়ে গেছে, কোন দৃষ্টিবান লোকের চোখের পর্দা খুলে নিয়ে সেই চোখে অপারেশন করে ফিট করে দিলেই সে দেখতে পাবে—অন্ততঃ আমার তো এই চেষ্টা সফল হয়েছে ?

—আপনিই কি প্রথম এইটা আবিষ্কার করেছেন।

—না, য়ুরোপের আর একজন ডাক্তার এই নিয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন এবং তিনি অনেক অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছেন কিন্তু আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত এই নিয়ে কেউ কোন চেষ্টা করেন নি, সেদিক থেকে আমি প্রথম।

—তাহলে আপনিই এখন অদ্বিতীয়।

প্রশংসা শুনে ডাক্তারের মুখে হাসি দেখা দিল।

বিনয়বাবু বললেন—কতজনকে সারিয়েছেন আজ পর্যন্ত ?

—মাত্র তিনজনকে। সব সময়ে তো আর ভাল লোকের চোখ পাওয়া যায় না, এই হচ্ছে মুস্কিল। কানা তো বহু কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তো আর তাদের চোখ দিতে পারছিনা। ভাল লোক কে আর স্বেচ্ছায় অপরের জন্য চোখ দিতে চায় বলুন।

—সত্যি কথা—দু'জনে মাথা নাড়লো।

ডাক্তার তখন নিজের গবেষণার কথা ভাল করে ব্যাখ্যা করতে সুরু করলেন।

উমানন্দ ভৈরব জায়গাটা সুন্দর।

নদীর বুকে একটা পাহাড়ী দ্বীপ। তার একপাশে ঘিরে একটি মন্দির আর কয়েক ঘর জেলের বাস, বাকীটা পাহাড়ী জঙ্গল। ব্রহ্মপুত্রের জল তীব্র গতিতে ছুটে এসে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে, মনে হয় এখনি নদীর স্রোতের মুখে দ্বীপটাকে টেনে নিয়ে সামনের ঘূর্ণীটার মধ্যে ফেলবে। ঘূর্ণীর শোঁ শোঁ টানের মুখে মন্দির ও গাছ-পালা কোথায় হারিয়ে যাবে।

মনে ভয় হয়।

কিন্তু দ্বীপের বুকে পা দিয়া হয় আনন্দ।

দ্বীপ তো নয় যেন একটা পাহাড়ী জাহাজ, জলস্রোতের মাঝে ভেসে চলেছে। এমনি করে বুঝি, অনন্ত নাগের কোলে অনন্ত জলের বুকে সৃষ্টির প্রথম দিনে নারায়ণ

ভেসে ছিলেন। চমৎকার। তু'পাশে নদের সীমানা যেখানে শেষ হয়ে গেছে তারই কোল ঘেঁসে পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি উঠেছে—সীমাহীন প্রকৃতির খেয়ালে মাটি মাথা তুলেছে, মেঘকে ছাড়িয়ে আরো উঠতে চায়, আকাশের ওই নীলপর্দার ওধারে, সৃষ্টিকর্তা ভগবান কোথায় লুকিয়ে আছেন তারই একবার সন্ধান নিতে চায় ; মাটির উপরে ওঠবার এই অপরীসীম কৌতূহল দেখে জল নীচের দিকে নামতে চাইছে, ঘুরে ঘুরে ঘন গর্জনে নীচে নামবার সাধনা করছে, জগতের নীচের এই মাটীর বাধার পারে কি আছে দেখতে চায় বুঝি। জলে ও মাটিতে প্রতিযোগিতা চলছে—মাটী যদি আকাশে উঁকি মারতে চায় জলই বা পাতালে যাবার চেষ্টা করবে না কেন ?

ছোট পাহাড়ের উপর উমানন্দ ভৈরবের একটী মন্দির। মন্দিরের চত্বরে বসে বসে চারি পাশে শুধু চেয়ে থাকতে ভাল লাগে। মুখের কথা হারিয়ে যায়। তাকিয়ে তাকিয়ে শ্যামল জন্মভূমির প্রতি মমতা জাগে—সোণার ভারতকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

সহসা সরোজ সুর করে গেয়ে উঠলো :

আমার এই দেশেতে জন্ম মাগো
যেন এই দেশেতে মরি।
এমন দেশটী কোথায় খুঁজে পাবে নাক' তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

তু'হাত জোড় করে ভারতমাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলো।

বিনয়বাবুও—

ডাক্তার হেসে উঠলো, বললো—খুব যে দেশভক্তি দেখছি, কবি না এনার্কিষ্ট ?

তু'জনের কেউই জবাব দিল না, ডাক্তারের এ ধরণের উপহাস তাদের ভাল লাগলো না।

দুপুরের দিকে সহসা মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হোল।

আশা হয়েছিল কিছুক্ষণ বাদেই বৃষ্টি থামবে কিন্তু ঘণ্টা তুয়েক বাদেও বৃষ্টি থামবার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তবে মাঝে একটু কম পড়লো।

মাঝি বললো—বাবু, এখন না বেরোলে আজ আর পৌছানো যাবে না।

—বেশ চলো আমরা তৈরী।

মন্দিরের পুরুত ঠাকুর বললেন—কিন্তু এখন না গেলেই আপনারা ভাল করতেন। দেখছেন তো আকাশে মেঘের অবস্থা, আবার এখনি হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হবে। তার উপর সামনে ঘূর্ণী, জল-ঝড়ে ঘূর্ণীর টান আরো বেড়ে গেছে। আজ এখানে থেকে খাওয়া-দাওয়া করলেই পারতেন, আমার বাড়ীতে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।

ডাক্তার হেসে বললো—আর তাতে তোমারও দু'পয়সা লাভ হবে, আমরা তো আর খেয়েদেয়ে এমনি যেতে পারবো না।

পুরুত ঠাকুর বললেন—তাই যদি আপনারা মনে করেন বাবু, তবে আপনারা যান।

নৌকায় উঠে ডাক্তার বললো—বাবা, তোমরা পাণ্ডা, কোথায় কোন ফিকিরে পয়সা আদায় করা যাবে তারই খালি মতলব করছ।

পুরুত আর কোন কথা বললেন না।

নৌকা ছেড়ে দিল।

ঘূর্ণীকে পাশ কাটিয়ে নৌকাখানি কিছুদূর আসতে না আসতেই পুরুতের কথা ফলে গেল। আকাশে যে কালো মেঘগুলো এতক্ষণ সূর্যকে ঢেকে অন্ধকার করেছিল, এবার তারা মুষলধারে ঝরে পড়লো। আকাশের চোখের জল মুছাবার জন্য বাতাসের আঁচল এগিয়ে এল। সে আঁচলের ধাক্কা সহে জলের মধ্যে নৌকা ঠিক রাখা কঠিন হোল। নৌকা সামলাতে গিয়া তীরে পৌছান আর হোল না, নৌকা হেলে দুলে গিয়ে পড়লো একবারে মাঝ দরিয়ায়। মাঝি একবার জিজ্ঞাসা করলো—বাবুরা সাঁতার জানেন তো?

বিনয়বাবু ও সরোজ মাথা নাড়লো—হ্যাঁ, তবে এখানে কুমীরের ভয় আছে নাকি?

—না বাবু, কুমীর তো বড় একটা চোখে পড়ে না।

ডাক্তার মুখখানি গম্ভীর করে বললেন—কিন্তু মশাই, আমি তো ভাল সাঁতার জানি না।

সরোজ হেসে বললো—ভাল জানেন না তো খারাপ জানেন তো? প্রাণের দায়ে তাই তখন ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাঁতারের দরকার হোল না। ঘণ্টাখানেক ঝড়-জলের সঙ্গে যুঝে মাঝি মাইল চার-পাঁচ দূরে নদীর তীরে নৌকা ভেড়ালো।

সেইখানে নামতে হোল।

একেবারে অচেনা জঙ্গল।

মাঝি বললো—কি করি বলুন বাবু, এই ঝড়-জলে নৌকা যে তীরে ভিড়িয়েছি সেই আমার বরাত জোর।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো—তা বলে কি এইখানে আজ রাত্রে পড়ে থাকতে হবে নাকি ?

—কি করি বলুন বাবু ? ঝড়-জল না থামলে আর নৌকা ছাড়তে ভরসা হয় না। তার উপর রাত্রে অন্ধকারে নৌকা চালাতে এখানে অনেক অসুবিধা আছে বাবু। চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত সবুর করতে হবে।

—চাঁদ উঠবে কি, আজ যে অমাবস্যা !

—অমাবস্যা ? তবে ?

মাঝির মুখ কালো হয়ে উঠলো।

ডাক্তার এইবার আফশোষ করলো—তাইতো, আগে এমন জানলে উমানন্দ ভৈরবে থাকলেই হোত।

বিনয়বাবু বললেন—কিন্তু তাতো হয়নি এখন সে কথা ভেবে লাভ কি ? (তারপর মাঝির পানে ফিরে বললেন) দেখ মাঝি, একটা উঁচু গাছে চড়ে দেখত, কাছাকাছি কোন গাঁ আছে কিনা।

—হাঁ বাবু, সেই বুদ্ধির কথা—বলে উপর দিকে চোখ তুলে কোন্ গাছটার মাথা অন্যগুলিকে ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে তাই দেখতে লাগলো।

গ্রামের সন্ধান মিললো না।

গাছে উঠে মাঝি বললো—কোথায় বাবু, মানুষের চিহ্নও নেই, কেবল জঙ্গল।

—তাহলে উপায় ?—তিনটে লোক থাকবো কোথায় ? খাই-ই বা কি ?

—নৌকার ছাউনীর মধ্যে আজকের রাতটা কাটিয়ে দিন বাবু।

—আজ রাতটা তাহ'লে উপোসেই যাবে।

—আমার তো আর কোন দোষ নেই বাবু এই দুর্যোগের মধ্যে কোথায় যাই বলুন ?

দুর্যোগ তখনও সমান ভাবে চলছে গাছের নীচে দাঁড়ালে কি হবে ? মাঝে মাঝে গাছের পাতা বেয়ে গায়ে মাথায় জল পড়ে বিরক্ত করে তুলছে।

সকলে মিলে আবার নৌকার ছইয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

মাঝি আরেকটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নৌকাখানা বাঁধলো, স্রোতের টানে রাত্রিতে ভেসে না যায়।

নৌকার ছাউনীর মধ্যে বসে আজগুবি ভূতুড়ে গল্প সুরু হোল।

ডাক্তার বললো—আমাদের হাসপাতালের মড়াখানায় রাত বারোটার পর যে যেতে পারে তাকে বলি বাহাদুর। সেবার হয়েছিল কি জানেন……

ছাত্রাবস্থায় ডাক্তার কবে বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রেখে এক ভাঁড় মাংস নিয়ে মড়াখানার চারিপাশে রাত বারটার সময় একবার ঘুরে আসতে গিয়েছিল, ফিরে আসবার সময় কোন নিমগাছের ছায়ায় কে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে হাতের মাংস কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল, তারপর কেমন করে ডাক্তার মাংসের ভাঁড় রক্ষা করেছিল, সেই ভীতিজনক কাহিনী ডাক্তার বলে চললো।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভূতুড়ে গল্প শুনতে বেশ লাগে। তারপর ডাক্তারের সরস করে গল্প বলবার ধরণটাও ভারী সুন্দর।

সরোজ বললো—আপনার ওসব ভূতটুত আমি মানিনে। আফ্রিকার অমন জঙ্গলে আমরা কতরাত কাটিয়ে এলুম, কিছু হোল না, তা কলকাতার সহরে! সে ভূত নয়, মানুষ-ভূত।

বিনয়বাবু হাসলেন।

ডাক্তার ক্ষেপে গেল।

সরোজ বললো—ভূত নেই।

ডাক্তার বললো—আছে!

অনেকক্ষণ এই সব তর্ক-বিতর্ক করতে করতে শেষে কখন যে তিন জনে ঘুমিয়ে পড়েছে তারা জানে না।

কোন এক সময় কি যেন একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

অন্ধকার গভীর রাত। কাছের মানুষকেও ঠিক ঠাহর করা যায় না। বিনয়বাবু চুপ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ছপ্…ছপ্! ছপ্…ছপ্!

বিনয়বাবু সরোজের গায়ে হাত দিয়ে চাপা গলায় ডাকলেন—সরোজ!

জবাব হোল—শুনেছি।

—দেখবে ?

—অন্ধকারে ঠাহর হবে না।

আবার শোনা গেল—ছপ্-ছপ্ ছপ্-ছপ্—

কে যেন এক হাঁটু জল ভেঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে—

বিনয়বাবু উঠে বসলেন, বললেন—বাঘ না আর কিছু ?

সরোজ বললো—মানুষও তো হতে পারে।

—তাহলে উপায় ? হাতিয়ার?

—পেন্সিল-কাটা ছুরি যা পকেটে আছে।

—তাইত, তবে কি করা যায়···হাঁ ঠিক, ওর চেয়ে ভাল হাতিয়ার আছে নৌকার দাঁড়, এসো, বাহিরে এসো।

ছ'জনে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বাহির হয়ে এল। বাহিরে এসে অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হোল না। নৌকার দাঁড় ছ'খানি ছ'জনে তুলে নিল। ঠিক সেই সময়ে নৌকাখানি সজোরে একবার ছুলে উঠলো। তাল সামলাতে গিয়ে সরোজ আর বিনয়বাবু যেই হেলে ছুলে ঠিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, অমনি শট্ করে কি যেন একটা তাদের গায়ে এসে লাগলো। মনে হোল একসঙ্গে যেন চোখের সামনে একশো বিদ্যুৎ জলে উঠে পায়ের নীচে মাটী ফেটে গেল, মাথায় যেন বাজ পড়লো, আগ্নেয়গিরির মুখ-নিঃসৃত তরল উষ্ণ ধাতুর মধ্যে সারা দেহের সমাধি হোল, একটা মূহুর্তের মধ্যে জগতের বুকে একটা খণ্ড-প্রলয় ঘটে গেল বুঝি···

ছ'জনের অজ্ঞান দেহ নৌকার পাটাতনের উপর লুটিয়ে পড়লো।

—তিন—

অসহ্য বেদনায় সরোজ গুম্‌ড়ে উঠলো—উঃ মাগো !

বিনয়বাবু ডাকলেন—সরোজ !

সরোজ চোখ মেললো।

আবার তখনি চোখ বুঁজলো। নৌকার ছাউনীর ভিতর দিয়া রোদটা একেবারে চোখের উপর এসে পড়েছে। চোখ খুলতেই চোখ ঝল্‌সে গেল।

তবে কি তারা স্বপ্ন দেখছিল নাকি ?

পর মুহূর্তেই সরোজ বুঝতে পারলো—না স্বপ্ন নয়। পাশ ফিরতে বুঝতে পারলো যে হাত পা বাঁধা।

নৌকা হেলে দুলে নাচছে। সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—নৌকা চল্‌ছে বিনয়দা ?

—চল্‌ছে, তবে কোথায় যাচ্ছে কে জানে !

—ডাক্তার ?

—আছি—ডাক্তারের কথা শোনা গেল।

সরোজ ও বিনয়বাবু মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, ওপাশের এক কোণে হাত পা বাঁধা ডাক্তার পড়ে আছে, মুখে তার হাসি ফুটেছে—দুঃখের হাসি।

সরোজ বললো—হাসছেন যে, ভয় করছে না ?

—ভয় ? কত মড়া কেটে এলুম রাত্তিরে তবু একদিন ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি আর আজ কতকগুলি জংলীদের ভয় করবো ? ব্যাটারা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বল দিকি ?

বিনয়বাবু বললেন—নৌকাটা যেদিকে এগিয়ে চলেছে আর রোদটা যেদিকে বেঁকে এসেছে এই দুই মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে আমরা উত্তরদিকে চলেছি—আসামের আরো গভীর জঙ্গলের দিকে।

সরোজ বললো—কিন্তু আমরা এই বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করি কেমন করে ? এরা এখন আমাদের নিয়ে যাচ্ছে কোথায় কে জানে, শেষে কি হবে কিছুই তো জানা নেই ?

—তা বটে, তা দেখ একজনের হাতের বাঁধন খুলতে পারলেই আর সকলের হাত পায়ের বাঁধন খুলতে দেরী লাগবে না, কিন্তু তারপর ? এই ছোট ছোট জানালা দিয়ে তো আর জলে লাফিয়ে পড়া যাবে না। আর বাইরে যাবার পথ তো বন্ধ—

সরোজ বললো—তার জন্য কি আমরা তৈরী হয়ে থাকি, যেই দরজা খুলবে অমনি ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়বো।

—কিন্তু তাতে লাভ কিছু হবে না। আমরা মাত্র তিন জন আর বাইরে ওরা কতজন আছে কে জানে। তাই বলছি সে চেষ্টা এখন থাক। এক কাজ কর দেখি, ওরা আমাদের পকেট থেকে কিছু তো বার করে নেয়নি, তুমি আমার ডায়েরীখানা বার কর দিকি—বলে বিনয়বাবু পাশ ফিরলেন, সরোজ তার

পাশের পকেট থেকে বাঁধা দু'হাত দিয়ে ডায়েরীখানা বাহির করে জিজ্ঞাসা করলো —কি হবে ?

—একখানা চিঠি লিখতে হবে। ডায়েরী থেকে একখানা পাতা ছিঁড়ে ফেল দিকি।

সরোজ পাতা ছিঁড়ে বিনয়বাবুর হাতে দিলে ডাক্তারের কাছ থেকে ঝর্ণা-কলম চেয়ে নিয়ে দু'হাত বাঁধা অবস্থায় বিনয়বাবু অনেক কষ্টে লিখলেন—

Doctor

Benoy

Saroj

caught by junglees

Captives carried northwards from Umananda Bhairab

1st. January

চিঠি লেখা শেষ হলে বিনয়বাবু নিজের পকেট থেকে নস্যির একটা শিশি বাহির করলেন, সমস্ত নস্যিটুকু ফেলে দিয়ে চিঠিখানি তার মধ্যে ভরে খুব শক্ত করে ছিপি লাগিয়ে জানালা দিয়ে জলে ফেলে দিলেন।

সরোজ বললো— ও চিঠি কেউ পাবে ?

—সে আমাদের বরাত। যদ্দিন শিশির মধ্যে জল না ঢুকবে তদ্দিন ওই শিশি ভাসতে ভাসতে চলবে। যদি কারুর চোখে পড়ে আর সে তুলে নিয়ে ব্যাপার না বুঝতে পেরে পুলিশের কাছে জমা দেয় তাহলেই আমাদের লাভ। ডেভিড ঠিক খবর পাবে।

—ওইটুকুই এখন আমাদের ভরসা—বলে সরোজ দুঃখের হাসি হাসলো।

ডাক্তার বললো—যাক, ও চিঠি কেউ পাবে কি না তার তো কোন স্থিরতা নেই। এখন উপস্থিত প্রাণরক্ষা হয় কি করে তাই বলুন দেখি? তেষ্টায় তো বুক শুকিয়ে গেছে।

—দেখুন, এক কাজ করুন, গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে ওই দরজাটায় লাথি মারুন, দরজা যে খুলবে তার কাছে ইসারা করে জল চাইবেন। জল দেয় তো ভাল, আর না দেয় তো কথাই নেই। তবে ব্যাটাদের মনের ভাবটা বোঝা যাবে।

—কিন্তু যদি আমাদের ঠেঙ্গিয়ে দেয় দু-চার ঘা ?

—উপায় নেই, হাতী পাঁকে পড়লে ব্যাংয়েও লাথি মারে।

—তবে তাই করি—বলে ডাক্তারবাবু ওদিকে সরে গিয়ে দরজায় জোড়া পায়ে লাথি মারতে লাগলো।

বাহিরে জন কয়েক কথা কইছিল শোনা গেল।

আবার লাথি।

কথা থামলো, দরজা খুললো, দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালো কালো বেঁটে মজবুত চেহারার একজন খাসিয়া, সে কি বললো বোঝা গেল না। ডাক্তার ইসারায় জল চাইল। লোকটা বুঝলো, হাসলো, তারপর বাইরে অরেকজনকে উদ্দেশ করে কি বললো। মিনিট কয়েক পরে একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ী করে জল এল, লোকটা মাটীর ভাঁড়ে করে তিনজনকে জল খেতে দিয়ে চলে গেল। তৃষ্ণা নিবৃত্তি হোল বটে তবে নদীর ঘোলা জল খেয়ে তৃপ্তি হোল না।

জংলীরা কেন যে তাদের বন্দী করেছে কে জানে? ব্যবহার কিন্তু ভালই বলতে হবে। যে দু'দিন নৌকা চললো এর মধ্যে ক্ষুধার আহার ও তৃষ্ণার জল একদিনও অসময়ে পাওয়া যায় নি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে যে জানবে তা ব্যাটারা কথাই বোঝে না, কাজেই জবাব দেবে কি?

বন্দী তিনজনের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

হাত পা বাঁধা বন্দীত্ব কি কারও ভালো লাগে, না কোনদিন লেগেছে।

পরদিন সকালে জংলীদের চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে হৈ হৈ পড়ে গেছে ব্যাপার দেখবার জন্য সরোজ উঠে বসলো, ওধারে একটা জানালা দিয়ে মুখ বাহির করে দেখলো: বাহিরে নদীর তীরে নৌকা ভিড়েছে। আর তীরে দাঁড়িয়ে আছে চার-পাঁচ শো খাসিয়া। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে একখানি করে টাঙ্গী আর কোমরে ছোট এক একটি রুলের সঙ্গে একটি করে লোহার ভাটা ঝুলছে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার উপর টাঙ্গী নাচাতে নাচাতে তারা একসঙ্গে তাল দিয়ে চীৎকার করছে, সেই চীৎকারেই সরোজের ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

বিনয়বাবু ও ডাক্তার উঠে বসে সরোজের মাথার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন—ব্যাপার কি!

সরোজ বললো—কী বুঝেছেন বিনয়বাবু?

—বোঝাবুঝির আর কি আছে, হাত পা বাঁধা—

তিনজনের মুখে দুঃখের হাসি ফুটে উঠলো।

ঠিক সেই সময়ে ছাউনীর দরজা খুলে দু'জন লোক ভিতরে এল। একজন সকলের পায়ের বাঁধন খুলে দিলে, তারপর ইসারা করে বাহিরে আসতে বললো। হাত বাঁধা তিনটী লোক ধীরে ধীরে ছাউনীর বাহিরে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে খাসিয়ারা দ্বিগুণ উৎসাহে চীৎকার করে উঠলো—ইয়াত পোয়া, ইয়াত পোয়া!

চীৎকারের তালে তালে হাতের পাঁচশো টাঙ্গি রোদে ঝল্‌সে উঠলো। সেদিকে তাকালে ভয় হবার কথা, তবে বিনয়বাবু ও সরোজ অনেক বিপদের ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছে বলেই অটলভাবে তীরে এসে নামলো। ডাক্তার ভয় পেয়েছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

—চার—

তীরে এসে নামতেই চারিদিকে হাততালি দিবার ধুম পড়ে গেল, যেন এতগুলি লোক তিনটে লোভনীয় শীকার পেয়েছে।

খাসিয়ারা তাদের ঘিরে ফেলে এক একজনের দু'পাশে দু'জন করে খাসিয়া সৈন্য ইংরাজি কায়দার হাত ধরে এগিয়ে চললো, বাকী সকলে রহিল পিছনে। হাতের বাঁধন তখন খুলে দেওয়া হয়েছে।

চলতে চলতে দিনের আলোতেও ধাঁধা লাগে প্রতি পদে, জঙ্গলের মধ্যে এযে একটা পথ হতে পারে তা বিশ্বাস করার উপায় নেই। গাছের পাতায় পাতায় মাথার উপরটা এত ঘন হয়ে উঠেছে যে পাতার আড়ালে সূর্য উঠেছে বলে তো মনেই হয় না, তার উপর মাটী ক্রমেই উঁচু হতে সুরু হয়েছে। উঠতে উঠতে হাঁটু টন টন করে ওঠে, বুকে নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যায়। বাংলার সমতল ভূমিতে যার জন্ম পাহাড়ের চাড়াই ভাঙ্গতে পারবে সে কতক্ষণ, কিন্তু তাবলে থামবার উপায় নেই। সৈন্যরা সমতলে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাবে।

ঘণ্টা তিনেক এমনি ভাবে চলার পর গায়ের কাপড় জামা যখন প্রায় ঘামে সপ্‌সপে হয়ে উঠেছে এমন সময় তারা পাহাড়ের মাথায় একটা প্রশস্ত জায়গায় এসে পৌছালো, চারপাশে ছোট ছোট কুটীর আর ক্ষেত, জংলীদের একটা গ্রাম বলে মনে হয়। এই বনশ্রেণীর পিছনে এমন একখানি গ্রাম যে থাকতে পারে তা ভাবা যায় না।

ফাঁকা জায়গাটির মাঝে একটী ঘর দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, সৈন্যের দল এদের সে-ঘরে এনে হাজির করলো। ঘরের মাঝে বেতে-বোনা একখানি চেয়ারের উপর একটি লোক বসে ছিল আর তার চারিপাশে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন। যারা সরোজ, বিনয়বাবু ও ডাক্তারকে নিয়ে এল, তারা সামনে ভক্তিভরে প্রণাম করলো। প্রণাম পর্ব শেষ হলে লোকটি তিনজনকে বসতে ইঙ্গিত করলো। যারা ধরে এনেছিল তাদের সঙ্গে কি কয়েকটা কথা বললো, তারা আবার প্রণাম করে পিছু হাঁটতে হাঁটতে বাহিরে চলে গেল।

চেয়ারে-বসা লোকটি এবার কথা বললো—তুমিই তো চোখের ডাক্তার, না?

ডাক্তার বললো – হ্যাঁ।

—আর এরা দু'জন?

—আমার বন্ধু।

—তোমায় এখানে ধরে আনা হয়েছে কেন জান?—আমার একটী জন্মান্ধ ছেলে আছে তাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে হবে—

—কিন্তু···

কিন্তুর ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। দেখতে-পায়-এমন একটি লোকের দুটি চোখ চাই, সে লোক আমার আছে।

পাশের দু'জন রক্ষীকে সে কি ইসারা করলো, সঙ্গে সঙ্গে তারা বাহির হয়ে ওপাশ থেকে একটা ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে এলো। ছেলেটিকে দেখিয়ে সর্দার বললো—এই আমার ছেলে, ভবিষ্যতে এই জমু-জাতির সর্দার হবে, চোখ দুটি ঠিক আছে কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না—

তিন বন্ধু তাকিয়ে দেখলো: সুস্থ বলবান কিশোর, সারা দেহ যেন ভাস্করের কালো-পাথরের তৈরী মূর্তি কিন্তুশুধু চোখ দুটির জন্য তার দেহের লালিত্য মূল্যহীন।

সর্দার তখন বললো—ওই মেয়েটির চোখ নিয়ে একে চোখ দিতে হবে—পারবে না?

এমন পরিষ্কার ইংরাজিতে সর্দার কথাগুলি বললো যে মনে হোল সে উচ্চশিক্ষিত।

তিন বন্ধু মেয়েটির পানে তাকালো: ফুটফুটে সুন্দর বছর বারোর মেয়ে, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি তার লাল হয়ে উঠেছে, মুখখানির পানে তাকিয়ে দেখলে কেমন-যেন মায়া হয়।

ডাক্তার মেয়েটির পানে তাকিয়ে বললো—অমন মেয়ের চোখ ছুটি নষ্ট করবো ?

—কখনো না—সরোজ বললো।

—থামো—সর্দার গর্জে উঠলো—এখানে তোমাদের কথার কোন মূল্য নেই। আমি সর্দার, আমার কথামত কাজ হবে। ওর উপর দয়া করে কি হবে, ও আমাদের শত্রুপক্ষের মেয়ে। আগামী অমাবস্যার রাত্রে যক্ষদেবের কাছে ওকে আমরা উৎসর্গ করবো। তখন তো ও একেবারেই মরবে। তার চেয়ে আমার ছেলের জন্য চোখ ছুটো দিয়ে যদি প্রাণে বাঁচে সেটা কি ভাল নয় ?

ডাক্তার খানিকক্ষণ কি ভাবলো তারপর মেয়েটিকে কাছে ডাকলো—খুকি, শোন।

মেয়েটি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে সে যা বললো তা সব না বুঝতে পারলেও তিন বন্ধুর চোখে জল এসে পড়লো। চোখ নষ্ট করা হবে সে জানতে পেরেছে, তাই কাতর কণ্ঠে জানাচ্ছে—বাঙ্গালী বাবুরা যেন তার চোখ নষ্ট না করেন।

মেয়েটির কান্না শুনে কারও দৃষ্টি কোমল হোল না, ভয়ে মেয়েটি ডাক্তারের পা ছুটি জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভাসিয়ে দিল।

অনেক চেষ্টা করে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে, চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে শান্ত করে ডাক্তার পা ছাড়িয়ে নিল, তারপর বললো—সর্দার, মেয়েটি তো চোখ দিতে রাজী নয়।

—ওর রাজী বা গররাজীতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমার মতে এখন ওকে চলতে হবে—

বিনয়বাবু বললেন—মুখে বললেই তো আর কাজ হবে না, অপরেশনের যন্ত্র-পাতি ও ওষুধ-পত্র—

—সব ঠিক করা আছে—

সরোজ এবার রাগে ফুলে উঠলো—যদি আমরা বলি এ কাজ আমরা পারব না সর্দার ?

—তুমি চুপ করো ছোকরা, তোমার পারা না-পারায় আমার কিছু আসে যায় না······তারপর ডাক্তার, কবে কাজ শেষ করবে ?

—আমি পারবনা সর্দার।

—পারবে না ? না পারা মানে জান তো ? জীবনে আর কোনদিন তোমরা

সূর্যের আলো দেখতে পাবে না, মুক্ত বাতাসের সঙ্গে তোমাদের আর কোন পরিচয় থাকবে না, অন্ধকার কারাগারে পলে পলে মরতে হবে। আর যদি আমার আদেশ পালন করো তাহলে তোমাদের গাধা-বোঝাই সোনা দোব।

ডাক্তারের হয়ে সরোজ জবাব দিল—তোমরা ভুল বুঝেছ সর্দার, আমরা বাঙ্গালীর ছেলে, যা অন্যায় বলে মনে করবো তার জন্য জীবন দিতে পারবো, তবু তাকে স্বীকার করবো না, বুঝলে ?

সর্দার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে বললো—ডাক্তার, তুমি পারবে কিনা ?

—পারবো না।

—এখনও ভেবে দেখ ?

—ভেবে দেখেছি সর্দার।

—বেশ—বলে সর্দার দুটি অনুচরের পানে ফিরে বিকৃত আসামী ভাষায় কি যেন বললো, তারা এসে তিনজনের হাত বাঁধলো তারপর সেই ঘরের বাহিরে নিয়ে এলো।

বাহিরে কিছুদূর যেতেই পাহাড়ের বুকে সুড়ঙ্গের মত একটা পথ দেখা গেল, তার ভিতর তিন বন্ধুকে নেমে যেতে হোল। যত নীচে নামে ততই অন্ধকার, বাতাসও নেই। কিন্তু এখন আর সে কথা ভেবে লাভ কি ! এ তো তারা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে, তিন বন্ধু পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে হাসলো—বড় দুঃখের সে হাসি।

আর একটু গিয়ে একটা গুহার মত ঘর পাওয়া গেল। বাতাস চলাচলের পথ নেই। যে আলো আছে তাতে পাশের লোকটাকে বুঝতে পারা যায় বটে কিন্তু চিনতে পারা যায় না। তার মধ্যে তিনজনকে রেখে দিয়ে বাঁশের বেড়া বন্ধ করে খসিয়ারা চলে গেল।

দম বন্ধ হয়ে আসে। পৃথিবীর আলো হাওয়ার সঙ্গে শেষ পরিচয় হয়ে গেছে। কিন্তু বাঁচবার উপায়ও তো কিছুই নাই।

শেষে বিনয়বাবু বললেন—বড্ড ভয় হচ্ছে, না ডাক্তার ?

—না, ভয় আর কি, তবে একটু ভুল হোল তখন মুখে অতো কিছু না বলে রাজী হয়ে গেলেই হোত। তারপর ফাঁক বুঝে একদিন পালানো যেত।

সরোজ বললো—তারা কি এতই বোকা ভেবেছেন? আপনাকে ওরা পালাবার স্থবিধা দিত? পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে আরো কত কষ্ট হোত' এখন পালাবার চেষ্টা না করে ধরা পড়েছি এই সান্ত্বনা।

বিনয়বাবু বললেন—পালানোর কথা এখন ছাড়ো, এই পাহাড়ী জঙ্গলে যাবেই বা কোথায়? ও কথা এখন থাক। পায়ের শব্দ পাচ্ছি, বাহিরে বোধহয় শত্রুপক্ষের কেউ আছে, চুপ করো।

সকলে চুপ করলো, বাহিরে সত্যই লঘু পদশব্দ শোনা যাচ্ছিল।

—পাঁচ—

অব্ছা অন্ধকারে তিনটি বন্ধু চুপ করে বসে রইল। জীবনের মায়া তখন তাদের মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে। এদিকে সময় বহে যাচ্ছে—অনুপল, বিপল, পল, দণ্ড, প্রহর, দিন পার হয়ে সন্ধ্যা বুঝি ঘনিয়ে এলো, পূর্বের অন্ধকার এখন অ-দৃষ্ট নিরন্ধ্র হয়ে উঠেছে। জল নেই, খাদ্য নেই, শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। বাহিরে যে জগৎ বেঁচে আছে এখানে বসে তা আর অনুভব করা চলে না। এখানে জীবন্তে কবর হয়ে গেছে যেন।

সহসা মনে হোল ঘরের সামনে কে যেন এসে দাঁড়ালো। তার পরেই প্রশ্ন শোনা গেল—আপনারা জেগে আছেন?

বাংলা কথা! তারা স্বপ্ন দেখছে নাকি?

আবার প্রশ্ন হোল—আপনারা জেগে আছেন?

নাঃ, তা হলে স্বপ্ন নয়। সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—কে?

—আস্তে! আমি আপনাদের মুক্তি দেবার জন্য এসেছি কিন্তু আস্তে কথা বলবেন, কেউ যেন শুনতে পায় না।

—আপনি কে?

—আমি বাঙ্গালী।

—আপনি এখন এখানে এলেন কেমন করে?

—স্বেচ্ছায় আসিনি, এরা আমায় ধরে এনেছে। চট্টগ্রামে আমার বাড়ী। তলোয়ার চালাতে পারতুম খুব ভাল, তাই এরা আমায় ধরে এনেছিল আমার

কাছে সে বিদ্যা শেখার জন্য। আপনারা তো বাঙ্গালী তাই আপনাদের পালাবার স্থবিধা করে দেবার জন্য আমি এসেছি।

—কিন্তু এরা যখন জানতে পারবে আপনার কথা, তখন ?

—সে জন্য আপনাদের ভাবতে হবে না, আপনারা সময় নষ্ট করবেন না, বেড়িয়ে আস্থন দরজা খুলে দিয়েছি—লোকটি দরজা খুলে দিল। এমন স্থযোগ কোনদিন কেউ অবহেলা করতে পারে না, তিনজনে ঘর থেকে বাহির হয়ে এল।

লোকটি বললো—আমার হাত ধরুন, গুহার বাহির পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসছি।

চারজনে হাত ধরা-ধরি করে অন্ধকারের বুকে অগ্রগামী হল। কোথাও এতটুকু শব্দ শোনা যাচ্ছে না, পাহাড়টা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।

কতকক্ষণ পরে তারা বাহিরে এসে দাঁড়ালো। মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা যেন নবজীবন ফিরে পেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুক্তিদাতাকে ভাল করে দেখতে না পেলেও বোঝা গেল। লোকটির মাথায় চুল পেকে গেছে, দুর্ভাবনায় ও অশান্তিতে দেহটী সামনের পানে ঝুঁকে পড়েছে। তবে এখনও দেহের পেশীগুলি ফুলে ফুলে আছে, এক সময় যে তলোয়ার চালাবার মত সবলতা তার ছিল তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তিনবন্ধু তার পানে তাকিয়ে আছে দেখে লোকটি বললো—এখনও হাঁ করে রইলেন ? তাড়াতাড়ি পালান।

বিনয়বাবু বললেন—আপনি যাবেন না ?

—না, আমার পালাবার উপায় নেই, আমি এখানে আছি জম্বু সর্দারের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য।

—প্রতিশোধ ?

—আমার আট বছরের মেয়েকে এরা ভল্লুকের মুখে ফেলে দিয়েছে, আমি বাপ হয়ে তা দেখেছি, তার শোধ আমি নোব না ? নিজের জীবন কি সবচেয়ে বড় হবে ? যাক্ সে কথা, ওই দেখুন ওরা মশাল জেলেছে, আপনারা পালান।

—কোনদিকে যাব ?

—ওই যে নীচে দেখছেন, ওই দিকে বরাবর নেবে যান, ওই নদীর তীরে বাঁদিকে মাইল পাঁচেক গেলেই আরেকদল জংলীর আড্ডায় গিয়ে পড়বেন, তারা এদের চেয়ে ভদ্র। সেই যে মেয়েটি দেখেছেন, ওটি তাদেরই সর্দারের

মেয়ে, এরা চুরি করে এনেছে। তাদের কাছে সব কথা বললে তারা যথেষ্ট সাহায্য করবে—যান, আর এদিকে এক মিনিটও দাঁড়াবেন না। মশালের আলোগুলো যেন কাছে আসছে।

তিনজনে তাড়াতাড়ি পাহাড় বহে নামতে আরম্ভ করলো।

খানিকটা নেমে এসেছে সহসা পাহাড়ের মাথায় তালি দেবার শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে একটা অস্পষ্ট গণ্ডগোল ও চীৎকরের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের মাথায় মশালে মশালে আলো হয়ে গেল।

বিনয়বাবু বললেন—ছোটো-ছোটো, ওরা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে।

তিন বন্ধু প্রাণপণ ছুটতে লাগলো। পথ বলে তো কিছুই নাই। পদে পদে বাধা। পাথর ডিঙ্গিয়ে, বন-বাদাড় ঠেলে, তিন বন্ধু ছুটলো।

পাহাড়ের উপর থেকে মশালের আলো ক্রমেই তাদের দিকে নেমে আসতে লাগলো।

প্রাণের মায়ায় তিনবন্ধু ছুটলো, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে, ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন, পা যেন আর চলতে চায় না, অথচ আবার ওই জংলীদের হাতে ধরা দিতে মন চায় না।

নীচে নদীর জল মাঝে মাঝে গাছের ফাঁকে নজরে পড়ছে, মনে হয় যেন লাফিয়ে পড়লেই হয়, ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো—নদীটা আর কতদূর বলুন দেখি ?

—তা প্রায় মাইল খানেক হবে।

—এখনও এক মাইল, কিন্তু আমি যে আর পারছি না, একটু বসি—বলে ডাক্তার বসে পড়লো।

সরোজ ও বিনয়বাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন, একজনকে ফেলে তো চলে যাওয়া যায় না। কিন্তু বসবার অবসর কোথায় ?

সহসা রাত্রির অন্ধকারে অদূরে গাছের পাতাগুলো মর্মর করে উঠলো। তারপরেই একটি খস্‌খস্ শব্দ। কারা যেন বনের শুক্‌না পাতাগুলির উপর দিয়ে চলে আস্‌ছে, কোন হিংস্র জন্তু হয়তো, কোন অতর্কিত মূহূর্তে ঝুপ করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। হাতে তো একটিও অস্ত্র নেই।

শব্দ নিকটতর হতে নিকটতম হয়ে এলো।

জামু সর্দারের অনুচরেরা নয় তো? মশাল নিভিয়ে তাদের অনুসরণ করছে?

পরমুহূর্তেই হাততালি দেবার শব্দ হোল, সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের ঝোপ থেকে কালো কালো পাহাড়ী মানুষের মুখগুলি ভেসে উঠলো।

আবার সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে বন্দী হতে হবে! এতো করে মুক্তি পেয়েও তারা পালাতে পারলো না। সরোজের মনে দপ্ করে একটা কথা ভেসে উঠলো, যে জিনিষটা এতক্ষণ তার কাঁধে এসে লাগছিল ডান হাত দিয়া সেটা ধরে দেখলো - গাছের ডাল নয়, বট গাছের জট্। দু'হাত দিয়া সেটাকে চেপে ধরে সজোরে একবার নাড়া দিয়ে মজবুত কিনা পরীক্ষা করে নিয়ে সরোজ কয়েক পা পিছিয়ে গেল। দুটি জংলী তখন ডাক্তার ও বিনয়বাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনের চোখে অসহায় দৃষ্টি, হাতে হাতিয়ার নেই কি করবে। তারা তো আবার বন্দী হোল। সরোজকেও এই ধরে ফেললো বলে! এমনি ভাবে ধরা দিতে হবে? কখনো না।



—চললুম বিনয়বাবু, যদি বাঁচি তো ফিরে আসবো —বলে আরেক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে বট গাছের জটটি ধরে সরোজ সামনের দিকে পূর্ণবেগে ছুটে গেল। সেই গতির বেগে তার দেহটা দুলতে দুলতে খানিকটা এগিয়ে যেতেই সরোজ বটগাছের জট ছেড়ে দিল। নীচেই নদী, তবে কত ফুট নীচে কে জানে! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, হুস্ হুস্ করে সে নীচে নামতে

চাপে এখনি বোধ হয় দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে, এরোপ্লেন থেকে প্যারাচুট নিয়ে নামা যেন এর চেয়ে অনেক সোজা।

কিন্তু সে অবস্থা কতক্ষণই বা। কয়েক পলকের মধ্যে নীচের খরস্রোতা নদীর জলে সরোজের দেহ ডুবে গেল। স্তব্ধ রাত্রির বুকে পাহাড়ের মাথায় ঝুপ্ করে একটা শব্দ হোল শুধু, আর কিছু নয়।

জংলীরা তখন ডাক্তার ও বিনয়বাবুকে ধরে ফেলেছে, দেখতে দেখতে তাদের হাতের মশাল আবার জ্বলে উঠলো।

অতটা উঁচু হতে জলের উপর পড়বার কোনদিন তো অভ্যাস নেই—সরোজের তলপেটে জলের আঘাত লাগলো। কি হোল ভাল করে বোঝবার আগেই সরোজের দেহটা জলের নীচে তলিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে স্রোতের টানে যখন ভেসে উঠলো সরোজের তখন সংজ্ঞা নাই।

স্রোতের টানে অজ্ঞান দেহ মড়ার মত ভেসে চললো।

একটা শুশুক ভুস্ করে পাশে ভেসে উঠলো, খাবার জিনিষ মনে করে কাপড়টা কামড়ে ধরে জলের মধ্যে আনন্দে এক ডিগ্‌বাজী খেল। কিন্তু বেচারার আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হোল না, কাপড়খানি সরোজের দেহ হতে খুলে গিয়ে শুশুকটা যতই ডিগ্‌বাজী খায় কাপড়খানি ততই পাকের পর পাক তাকে জড়াতে থাকে, শেষে বেচারা ভয় পেয়ে অতল জলে ডুবলো।

জলের বুকে ভাসতে ভাসতে আর ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা লেগে অল্প অল্প করে সরোজের চেতনা ফিরে এল।

ভাল করে নিজের অবস্থাটা মনে করতে খানিকক্ষণ সময় লাগলো।

উপুড় হয়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে দেখে পেট ব্যথায় টনটন করে উঠছে, ভাল করে পা ছুঁড়তে পারছে না, কাজেই আবার ঘুরে পড়ে চিৎ হয়ে সে সাঁতার কাটতে লাগলো—অনেকটা সহজ বলে মনে হোল।

আধঘণ্টা সাঁতার কেটে এসে সরোজ তীরে পৌছিল, উঠতে গিয়া দেখে দাঁড়াতে পারছে না। উঠে আসতে বেশ কষ্ট হোল।

তীরে উঠে দেখলো কাপড় নাই, সে শুধু জাঙ্গিয়া পরে আছে। জামা ও গেঞ্জি খুলে পকেট থেকে রুমাল বের করে গায়ের জল মুছলো। এইবার তার মনে হোল

শীত করছে, জর এলো হয়তো! দেখতে দেখতে সরোজের কাঁপুনি আরো বেড়ে গেল, সেইখানেই শুয়ে পড়লো।···

চমৎকার নরম বিছানা, খালি পড়ে পড়ে ঘুমোতে ইচ্ছা করে, কিন্তু···এমন বিছানা, এমন ঘর, সে কি স্বপ্ন দেখছে? নাঃ, স্বপ্নতো নয়, এতো সত্যি! তবে এ সে কোথায় এসে পড়লো? সরোজ উঠে বসতে গেল, পারলো না, সারা দেহে অসহ্য বেদনা, জর হয়েছে।—উঃ!

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে একজন খাসিয়া এসে ঢুকলো, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় সে যা বললো, আসামী ভাষা হলেও সরোজের বুঝতে বিশেষ কষ্ট হোল না, বললো—খাবে?

সরোজ বললো—না, বড় ব্যথা, উঃ—

সরোজ পাশ ফিরলো, লোকটী সরোজের কপালে হাত দিয়ে দেখলো, তারপর আপন মনে কি সব বকতে বকতে চলে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে কতকগুলি গাছের পাতা নিয়ে লোকটি আবার ফিরে এল, বললো—এগুলো খাও জর সেরে যাবে।

সরোজ একবার ভেবে নিল এগুলো খাওয়া ঠিক হবে কিনা, কিন্তু লোকটী জংলী হলেও তার সঙ্গে এতক্ষণ বন্ধু ভাবেই চলছে, খেতে ক্ষতি কি? আর আসামী জরের ওষুধ আসামীদেরই ভাল মত জানা থাকা উচিত। সরোজ পাতাগুলি একে একে চিবিয়ে খেল। খাওয়া শেষ হলে লোকটি একটি মাটির পাত্রে দুধ নিয়ে এল। দুধটুকু পান করেই সরোজের মনে হোল যেন এবার একটু ঘুমিয়ে নিলে ভাল হয়। সরোজ চোখ বুঁজলো।

সেই দিনই সরোজের জর ছাড়লো।

অবসন্ন দেহে কাজ করবার মত সবলতা ফিরে আসতে আরো দিন তিনেক বিশ্রাম নিতে হোল।

সেই ফাঁকে এই সব জংলীদের সঙ্গে হোল বন্ধুত্ব। জংলী সর্দার বললো—জমুদের উপর আমাদের অভিযোগও তো বড় কম নয়, ব্যাটারা সাক্ষাৎ সয়তান। ওই যে মেয়েটির কথা বলছেন বাবু, ও আমারই মেয়ে, ব্যাটারা সে দিন আমাদের গ্রাম লুঠ করে ধরে নিয়ে গেছে। চোখ-টোক সব মিছে কথা। কাণা ছেলের কি আর চোখ হয়, ওরা সব ভল্লুকের মুখে যাবে বাবু?

—ভল্লুকের মুখে যাবে ?

—হ্যাঁ, ওরা যকের পূজা করে, ভল্লুক সে দেবতার বাহন। দেবতারা তো কিছু আহার করে না তাই অনেকগুলো ভল্লুক পোষা আছে, দেবতার ভোগ সেই বাহনকে খাওয়ানো হয়। আপনারা তো বাবু হাওয়াই-পাখীর পেটের মধ্যে বসে আকাশে ওড়েন দেখেছি, আমার মেয়েকে বাঁচান-না হুজুর, আপনার বন্ধুদের তো বাঁচাবেনই, আমার মেয়েটা কেন বাদ যায় হুজুর। আমি, শুধু আমি কেন, আমরা সব আপনার কেনা-চাকর হয়ে থাকবো।

সরোজ হাসলো, বললো—কেনা-চাকরের ত আমার দরকার নেই। এখন কোন রকমে সাহায্য করতে পার, যাতে আমি কামরূপ পর্যন্ত গিয়ে পৌছতে পারি। আমি একা তো আর কিছু করতে পারবো না, লোকজন চাইত, গুলি, গোলা, বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র !

— নিশ্চয়ই বাবু, আমার দশ-দাঁড়ী ছিপে কামরূপ পৌছে দিয়ে সেখানে আমার লোক অপেক্ষা করবে, ওই ছিপই আবার আপনাদের নিয়ে আসবে।

সরোজ বললো—বেশ, কালই আমি যাব।

পরদিন নৌকা তৈরী হোল সরোজকে কামরূপে নিয়ে যাবার জন্য।

আবাংসর্দার সরোজকে নদীর তীরে এসে বিদায় দিয়ে গেল, বললো— আপনিই এখন ভরসা বাবু, এমন জিনিষ আনবেন যাতে ওই গাঁ সুদ্ধ উজাড় হয়ে যায়—সব খতম্।

সরোজ হেসে নৌকায় উঠে বসলো।

—ছয়—

পুলিশ মহলে হৈ চৈ পড়ে গেছে।

কলিকাতার বিখ্যাত চোখের ডাক্তার অজয় চৌধুরী ও তার সঙ্গী দু'জন ধনী বন্ধু কামরূপে উমানন্দ ভৈরব দেখতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

লোক তিনটি ঘূর্ণীর জলে ডুবে গেলেই সকল লেঠা চুকে যেত, পুলিশও পরিশ্রম হতে বেঁচে যেত। কিন্তু আসামের কোন এক বনরক্ষক সাহেব সেদিন নৌকা করে সান্ধ্য ভ্রমণ করতে করতে নদীর জলে একটা শিশি ভেসে যেতে দেখে উঠিয়ে নিয়ে তার মধ্যে একখানি চিঠি পেয়েছে, সেই চিঠিখানিতে

নিরুদ্দিষ্ট লোক তিনজনের সন্ধান আছে বলে জানা যায়, জংলীরা তাদের ধরে নিয়ে গেছে বলে প্রকাশ। পুলিশ তাদের উদ্ধার করবার জন্য তৈরী হচ্ছে।

খবরের কাগজে খবর পেয়েই কলিকাতায় পুলিশের অনুমতি-পত্র নিয়ে ডেভিড ও সনি কামাখ্যায় রওনা হোল।

আসামী পুলিশেরা তো প্রথমে হেসে উড়িয়েই দিয়েছিল—যে বাঙালী একঘণ্টা পাহাড়ের চড়াই উঠে হাঁপিয়ে পড়ে, তারা যাবে কিনা আসামের জঙ্গলে!—জানা আছে!

ডেভিড বললো—আমরা দু'জনেই ইংরাজ।

পুলিশের কর্তারা হেঁসে বাঁচে না, বললো—ধুতি আর পাঞ্জাবী পরা ইংরাজ! ভাল ইংরাজি বলতে পারলে আর চেহারাখানা ফর্সা হলেই বুঝি ইংরাজ হয়?

ডেভিড বুঝলো এদের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই, বললো—বেশ, আমরা বাঙালী। তবে বাঙালীদের সাহস আছে কিনা দেখাবার জন্য আমরা শুধু দু'জনে জঙ্গলের মধ্যে যাবো। আপনাদের সাহায্যের দরকার নেই, শুধু সেই চিঠিখানা একবার দেখতে চাই আর বন্দুক, গুলি, বারুদ, যা দরকার সব আমরা এনেছি।

—কিন্তু বন্দুক গুলি বারুদ তো আপনাদের ছাড়বো না। আপনারা যে এনার্কিষ্ট নন্ তার প্রমাণ?

—প্রমাণ? এই দেখুন কোলকাতার পুলিশ-কমিশনারের চিঠি।

চিঠিখানা বাহির করে পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্টের হাতে দিতেই তিনি সাগ্রহে পড়ে ফেললেন। তারপর বললেন—আগে একথা বলতে হয়, আপনারা যে পুলিশের লোক তাতো জানতুম না। তা লোকজন যা দরকার আপনি নিয়ে যান।

—লোকজন একজনও দরকার নেই। আপনি আমাদের বাঙালী বলে খুব অবজ্ঞা করছিলেন না? তাই আমি দেখিয়ে দেব যে বাঙালীর কত সাহস—আমরা এই দু'জন গিয়ে তিন জনকে ঠিক উদ্ধার করে আনবো।

—কিন্তু আপনারা তো বাঙালী নন চিঠিতে দেখলুম।

—হ্যাঁ, আমরা দু'জনেই ইংরাজ। তবে ইংরাজ হলেই খুব সাহসী হবে এমন তো কোন কথা নেই। আমাদের যে দু'জন বন্ধুকে জংলীরা

ধরে নিয়ে গেছে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সাহসী, বুঝলেন? আর আপনি তো একটু আগেই বললেন, ফর্সা চেহারা আর ভাল ইংরাজী বললেই সাহেব হওয়া যায় না, আপনি আমাদের বাঙালী বলেই জানবেন।

পুলিশ-সুপারিনটেনডেণ্ট খানিকক্ষণ কথা কইতে পারলেন না। অন্য কেউ হলে গলা টিপে থানা থেকে বাহির করে দিতেন কিন্তু একে ধুতি-চাদর-পরা সাহেব তার উপর পুলিশ-কমিশনারের পরিচয়-পত্র, কাজেই তিনি চুপ করে রইলেন।

পরদিন সকালে ডেভিড ও সনি গোটা চারেক প্যাকিং বাক্স মুটের মাথায় চাপিয়ে, কাঁধে বন্দুক ও কোমরে ছোরা ও রিভলভার ঝুলিয়ে বাহির হয়ে পড়লো।

সরোজ ফিরছিল।

জংলীদের ছিপ্ চালাবার কৌশল চমৎকার। দ্রুত গতিতে ছিপখানি আগিয়ে চলেছে, একটু হেলছে না, একটু দুল্‌ছেনা, ঢেউ ঠেলে তীরের মত চলছে। দেখে দেখে সরোজের মনে হোল বাচ খেলার প্রতিযোগিতা করলে অতি সহজেই এরা প্রথম হতে পারে।

যাক্, পথ বড় কম নয়। ঘুরে ফিরে যেতে প্রায় দেড় দিন লাগে।

প্রথম দিনটা সরোজের মন্দ কাটে নাই। ছিপে উঠে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। দু'পাশে পাহাড় আর জঙ্গলকে পিছনে ঠেলে সামনে আগিয়ে যেতে ভাল লাগে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলেই দৃষ্টি আর বেশীদূর চলে না, মনটা ভারী হয়ে উঠে। ডাক্তার ও বিনয়বাবুকে নিয়ে জংলীরা এখন কি করছে, সেই দুর্ভাবনা জাগে। চাঁদ উঠে। নদীর জলে ঢেউয়ের তালে তালে গাছের পাতায়, পাহাড়ের মাথায়, মেঘের কোলে, চাঁদের আলো নেচে চলে, সরোজের তা ভালো লাগে না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠে কঠিন পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে দু'খানি পরিচিত মুখ। আহার না পেয়ে, জল না খেয়ে সে-মুখে ব্যথা ফুটে উঠেছে, শুধু প্রতীক্ষায় কান পেতে আছে কখন্ বাহিরে পাহাড়ের বুকে সরোজের বন্দুকের কর্কশ শব্দ শোনা যাবে।...

ভাবতে ভাবতে সরোজ চঞ্চল হয়ে উঠে। তখনি একটা-কিছু করে ফেলতে ইচ্ছা করে। আবার ধীরে ধীরে নদীর ঠাণ্ডা বাতাস লেগে তার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, ঘুম পায়। চোখ বুঁজে একবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করে কিন্তু সরু ছিপে শোবার জায়গা কোথায়? নড়তে-চড়তে ছিপ দুলে ওঠে, মাঝি হাঁকে—হুঁসিয়ার!

সরোজ ঠিক হয়ে বসলো।

মাঝি জিজ্ঞাসা করলো—ঘুমাবেন বাবু? তীরে নৌকা লাগাবো?

বন্ধুরা পাহাড়ী গুহায় অন্ধকারে পড়ে আছে, এখন তার ঘুমাবার অবসর কোথায়? সরোজ বললো—না, ঘুমাব না, চলো—

কিন্তু বিপদ যখন আসে, একা আসে না। সরোজ আহার-নিদ্রা ছেড়ে অত তাড়াতাড়ি করলে কি হবে, বেশীদূর যেতে-না-যেতেই আবার নূতন বিপদ ঘটলো।

নদীর তীর দিয়ে একদল হাতী যাচ্ছিল। একটা বাচ্চা হাতী বোধ হয় খেলা করতে করতে জলে গিয়া পড়েছিল, সুবিধা বুঝে একটা কুমীর তাকে টেনে নিয়ে গেল। কোন রকমেই নিজেকে রক্ষা করতে না পেরে বাচ্চা হাতীটা প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলো। দলের বড় বড় হাতীগুলির মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, দলশুদ্ধ জলে গিয়ে নামলো সেই বাচ্চাটিকে রক্ষা করবার জন্য। সমস্ত জল তোলপাড় হয়ে উঠলো। বাচ্চাটিকে তার আগেই কুমীর জলের অনেক নীচে টেনে নিয়ে গেছে। হাতীর দল বাচ্চাটিকে খুঁজে হয়রান হয়ে, রাগে গর্জে সারা নদী তোলপাড় করে তুললো। শেষে সরোজদের ছিপ নৌকাখানি চোখে পড়তে, যত অনিষ্টের মূল ওই নৌকাখানি মনে করে কয়েকটি হাতী সেইদিকে সাঁতরে গিয়ে শুঁড়ে করে নৌকাখানি উল্টে দিল। তারপর লোকগুলি জলে পড়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে দেখে শুঁড়ে জড়িয়ে তাদের এদিকে ওদিকে ছুঁড়তে লাগলো—সাঁতারুরা যেমন করে ওয়াটার-পোলো খেলে।

সরোজের তন্দ্রা ছুটে গেল। ঘটনাটা বুঝে নিতে বেশীক্ষণ লাগলো না, অন্ধকারে যে কোন রকমেই হোক হাতীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে একেবারে ওপারে গিয়ে উঠবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু—

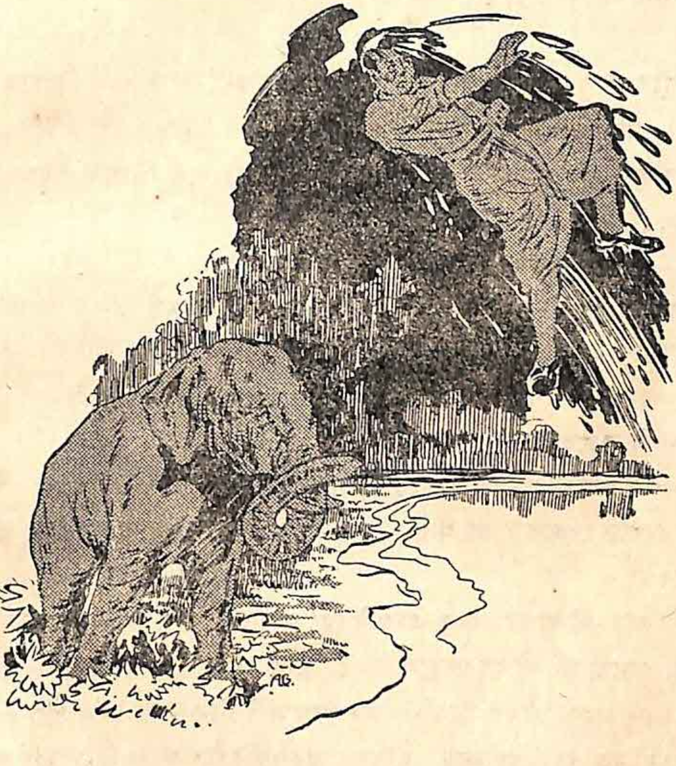
যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।

সরোজ ডুব্ সাঁতারে নদী পার হচ্ছিল, কিন্তু একেবারে তো আর ডুবে থাকা চলে না, নিঃশ্বাস ফেলা চাইতো। সরোজ নিঃশ্বাস ফেলার জন্য ভেসে উঠলো একেবারে একটা হাতীর শুঁড়ের ডগায়। আর যায় কোথা, হাতীটা তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে দিল।

সরোজ গিয়ে পড়লো আরেকটা হাতীর সামনে। সেও ছুঁড়ে দিল।

ঝট্‌পট্ করে নাকে মুখে জল ঢুকে, ডুবে, ভেসে, আঘাত লেগে, কি যে হোল

সরোজ তার কিছুই বুঝতে পারলো না, চোখ চাইতে পারলো না, তার মাথার মধ্যে কি যেন একটা ঘটে গেল, শুধু মনে হতে লাগলো একটা কথা—মৃত্যু……



মৃত্যু… যে মরণকে এতদিন দুর্জয় সাহস, বুদ্ধি ও সাবধানতায় ফাঁকি দিয়ে আসছিল সেই মরণ আজ তাকে গ্রেপ্তার করেছে, জীবনের ওপারে, অন্ধকারে এখনই তাকে টেনে নিয়ে যাবে…মৃত্যু…অন্ধকার……

শ্যামল বাংলার সমতল ঘাসজমির পিছনেই যে এমন দুর্গম ঘন পাহাড়ী জঙ্গল থাকতে পারে, ডেভিড বা সনি এর আগে তা ধারণাও করতে পারেনি, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এক পা এগুনো মুস্কিল। আফ্রিকার জঙ্গলকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে।

নদীর তীরে জঙ্গলটা তবু একটু ফাঁকা হয়ে গেছে, গাছের সারি কমে গেছে বলে পথ করে চলা সহজ হয়, দু'জনে নদীর তীর দিয়েই চললো।

অজানার উদ্দেশ, কদ্দিন কদ্দুর যেতে হবে কিছুই জানা নেই। তবু চলতে হবে বলেই যেন পথ চলা।

চলছে তো চলেছেই।

রাত্রে আগুন জেলে যাদের পাহারা দেবার কথা, তারা সহসা চীৎকার করে উঠলো—বাবু বাবু, বিপদ—মহা বিপদ—

ডেভিড, সনি ও সকলের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে, কি ?

—শুনতে পাচ্ছেন না ?

শুনতে সকলেই পেয়েছিল, দূরে বহুদূরে সমুদ্র গর্জনের মত একটা অস্পষ্ট শব্দ।

ডেভিড বললো—কি, ঝড় উঠেছে বুঝি ?

—না, হাতীর পাল আসছে—এখুনি এসে পড়বে, নিন তাড়াতাড়ি

—কি করবো ?

—কি করবেন ! একটা গাছে উঠলে ভাল হয়—উঁচু শক্ত বড় গাছে (চারি-পাশে দেখতে দেখতে) ওই গাছটা বেশ মজবুত, না হলে অন্য গাছ হাতীর সামনে টিঁকবে না—

—আর এই বাক্সগুলো ? এইগুলি তো আমাদের প্রাণ, ওর মধ্যে গুলি-বারুদ আছে, ওগুলো যদি নষ্ট হয় তাহলে তো যে কাজে যাচ্ছি তাই বিফল হবে···

—সে ব্যবস্থা আমরা করেছি—বলে পাশাপাশি তিন-চারটি গাছে যেখানে একটি ঝোপের মত করে ফেলেছে সেইখানে বাক্সগুলি ঠিক মত লুকিয়া রেখে ক'জনে মিলে গাছে উঠে বসলো। সারাদিনের পরিশ্রম। দেহ মন শ্রান্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে, কোথায় ভাল করে ঘুমিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে তা নয় গাছে চড়ে বসে থাকা।

এদিকে মেঘের গর্জন ক্রমেই কাছে আসতে লাগলো। শুনতে শুনতে মনে হয়, যেন একটা ভীষণ জলোচ্ছ্বাস গর্জন করতে করতে চারিদিক ভাসিয়ে ছুটে আসছে। যেন প্রলয়ের পূর্ব মুহূর্ত। অনন্ত জল এসে নদী, গাছ, বন—সব ভাসিয়ে দিয়ে যাবে, কেউ বাঁচবে না, কিছুই থাকবে না······

কুলিগুলি তো গাছে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। দূরের বনে তখন মড় মড় করে গাছ ভাঙ্গছে, থপ্ থপ্ করে হাতীর পায়ের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুধু অন্ধকারের জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

সহসা একটা কুলি চীৎকার করে উঠলো—ভল্লুক-ভল্লুক ! বাবা গো !

লোকটা পড়ে যায় আর কি ! ডেভিড তাকে ধরে ফেললো।

একটা ভল্লুক তার পাশে গাছে উঠে বসে আছে।

ডেভিড বন্দুক বের করলো। কিন্তু গুলি করা ঠিক হবে কিনা তা বুঝতে পারলো না। ভল্লুকটা যদি গুলি খেয়ে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে তা হলে সবশুদ্ধ নীচে পড়ে হাতীর পায়ের তলায় মরতে হবে।

ডেভিড গুলি করতে পারলো না।

নদীর জলে তখন হাতীর মাতামাতি স্থরু হয়ে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গাছের মাথায় ঝপাৎ করে কি যেন একটা এসে পড়লো। কুলিরা চীৎকার করে সকলে পড়ে যায় আর কি ! ভল্লুকটি নীচে পড়ে গেল। দু'জন কুলি আর ডেভিড ঘুরে নীচেই পড়ে যেত, শুধু গাছে পা লট্‌কানো ছিল বলে রক্ষা, মাথাটা নীচের দিকে করে ঝুলতে লাগলো।

আবার ঠিক হয়ে গাছে বসতে ডেভিডের দেরী হোল না। নিজে উঠে বসে অনেক কষ্ট করে কুলি দু'জনকেও সে তুলে বসালো। তারপর টর্চের আলো ফেলে মাথার উপর কি পড়েছে একবার দেখলো !—

– সাদা জামা কাপড়···মানুষ বলে মনে হচ্ছে। দেখতো ওটা মানুষ নাকি ?

সব কুলি সমস্বরে জবাব দিল – হ্যাঁ বাবু।

—তোরা কেউ ওপরে গিয়ে লোকটিকে নামাতে পারবি ?

– সকাল না হলে পারবো না বাবু।

– লোকটি অমনভাবে সারারাত থাকলে মারা যাবে যে রে ?

-- মরতে কি আর বাকী আছে বাবু ! হাতীর দলের সামনে পড়েছিল, খেলা করতে করতে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়েছে। কোত্থেকে ওই গাছের উপর এসে পড়েছে কে জানে ! ওকি আর এখনও বেঁচে আছে বাবু, আবার ওকে নামাতে গিয়ে আমরা হয়তো রাত্রের অন্ধকারে পড়ে মরবো হাত পা পিছলে, সকাল হোক তারপর দেখা যাবে।

ডেভিড সকাল হবার প্রতীক্ষায় চুপ করে রইল।

সনি জিজ্ঞাসা করলো – রাত ক' প্রহর রে ?

—তিন প্রহর বাবু।

সহসা গাছের উপরকার লোকটি একটু নড়ে-চড়ে উঠলো, অস্পষ্ট কথা শোনা গেল—উঃ ! বাবা গো !

লোকটি আর একটু নড়তে গেল, গাছের ডালগুলি তার গায়ে বিঁধতেই লোকটি আবার কাতর ভাবে বললো—বাবা ! বাবাগো !

গলাটা চেনা-চেনা।

—কে বলুন দেখি ?—সনি জিজ্ঞাসা করলো।

—যেই হোক, বেঁচে যখন আছে, তখন এখনই ওকে গাছ থেকে নামাতে হবে। (কুলিদের পানে ফিরে) এখনি নামাতে হবে ওকে, দেখছিস না বেঁচে আছে, কথা বলছে—

—এই অন্ধকারে ? পারবো না বাবু।

—বকশিস্ দোব এক টাকা করে।

—যদি পড়ি তো মরে যাব যে বাবু! আর সকাল হতে বেশী দেরী নেই বাবু। দু' তিন ঘণ্টা, পরেই নামাবো—

—ততক্ষণে লোকটি যদি মারা যায়।

—দু'তিন ঘণ্টায় কি লোক মরে বাবু !

—ওঃ বাবা গো—! আঃ—

ইস্ ! একটি লোক অমন ভাবে চোখের সাম্‌নে গোঙাবে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে তারা বসে দেখবে—অসম্ভব। ডেভিড বললো—আমি টর্চের আলো ধরছি তোমরা ওকে নামাও—

— পারবো না বাবু।

—পারতে হবে।—না পারলে, তোমাদের আমি গুলি করবো, এই জঙ্গলে দেখি তোমাদের কে রক্ষা করে। (ডেভিড পিস্তল বাহির করলো) হয় মর, না হয় হুকুম তামিল কর—বলে কুলিগুলোকে ভয় দেখাবার জন্য ডেভিড পিস্তলের ঘোড়া টিপলো। 'ক্রাক্' 'ক্রাক্' করে পিস্তল গর্জে উঠলো, একটা আগুনের শিখা তীরের মত সামনে ছুটে গেল, এবার কুলিরা সত্যই ভয় পেল।

—ডেভিড বললো – হুকুম মানবি, না—না ?

—মানবো হুজুর।

সকলে গাছ থেকে নামলো, নীচে যে আগুন জ্বলছিল তা ততক্ষণে নিভে

এসেছে, কাঠ-কুটো জোগাড় করে আগুনকে আরো উজ্জ্বল করে তোলা হোল। সেই আলোয় তিনজন কুলি দড়ি নিয়ে উপরে উঠে গেল, দড়ি বেঁধে গাছের উপর থেকে লোকটিকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হোল।

সনি ও ডেভিড দড়ি খুলতে গিয়ে লোকটির মুখের পানে টর্চের আলো ফেলে দেখে ঃ সরোজ। বিস্ময়ে তাদের মুখের কথা হারিয়ে গেল।

ঠিক সেই মূহূর্তে তাদের পাশের একটি কুলি চীৎকার করে উঠলো। সনি মুখ ফিরিয়ে দেখবার আগেই পাশে গাছের শাখায় একটি সাপ ঝুলছিল, ছপ্ করে সনির ডান হাতে ছোবল মারলো। আর্তনাদ করে সনি সেইখানে বসে পড়লো।

বিপদের উপর বিপদ। সরোজকে যে দড়ি দিয়ে নামনো হয়েছিল, সেই দড়ি দিয়ে সনির হাতে ডেভিড একটির পর একটি তাগা বেঁধে দিল, বিষের রক্ত যাতে সারা দেহে ছড়াতে না পারে।

দেখতে দেখতে সনির হাতখানি ফুলে নীল হয়ে উঠলো। কিন্তু রক্ত চলাচল কখনো একেবারে বন্ধ হতে পারে না। দড়ির ফাঁস বাঁধার জন্য বেশী করে রক্ত চলাচল না হলেও কম করেও তো হচ্ছিল বটে, তার ফলে আকাশে প্রভাতী আলো দেখা দিবার আগেই সনি বিষে জর-জর হয়ে মাটীর উপর শুয়ে পড়লো।

কুলিদের চেষ্টায় সরোজের তখন জ্ঞান ফিরে এসেছে, বাঁ হাতটী ফুলে উঠেছে, নড়াবার উপায় নেই, ভেঙ্গে গেছে হয়তো। কয়েক লহমার মধ্যেই স্বস্থ হয়ে সে উঠে বসলো। ডেভিডকে দেখে বললো—আশ্চর্য, তোমায় আমি এখানে দেখবো আশাই করিনি, খবর পেলে কেমন করে।

—নস্যির শিশির মধ্যে চিঠি দিয়েছিলে মনে আছে ?

—ও বুঝেছি (সনিকে অমনিভাবে পড়ে থাকতে দেখে) তা সনির কি হোল, অমনভাবে হাত বাঁধা যে ?

—সাপে কামড়েছে ?

—ইস্ বল কি, তাইত! (একটি কুলির পানে ফিরে) এই শোন—সাপে কামড়ানোর ওষুধ জানিস্ ?

—না হুজুর।

—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করে দেখ্তো তোদের মধ্যে কেউ জানে কি না ?

কুলিটি উঠে গিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করে ফিরে এসে বললো—না হুজুর কেউ জানে না।

—আচ্ছা, এখানে কোন গাঁ আছে কিনা জানিস ?

—আছে হুজুর পাঁচ ক্রোশ দূরে, এক প্রহরের পথ !

—ছুটে যা, সেখান থেকে একটি সাপের ওঝা ডেকে আন্ নইলে বাবু মারা পড়বে—

—একা ? পারবো না বাবু, ভয় লাগে, যা জঙ্গল !

—বেশ দু'জনে যা, ছুটে যাবি আর আস্‌বি, বুঝলি ?

কুলিটা মাথা নেড়ে জানালো সে বুঝেছে। তারপর আর একজনকে ডেকে নিয়ে দু'গাছি লাঠি নিয়ে দু'জনে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ডেভিড আরেক জনকে ডেকে বললো—এই রুমাল ভিজিয়ে জল নিয়ে আয়—

ডেভিড পকেট থেকে দু'খানি রুমাল বাহির করে দিল। কুলিরা রুমাল দু'খানি ভিজিয়ে আনলো। জল শুদ্ধ সেই ভিজা রুমাল সনির মাথায় দেওয়া হোল, যাতে বিষের অপকার কম হয়।

মুখে কারও কথা নেই। ভবিষ্যতের পানে চেয়ে সকলে চুপ করে বসে রইল। যদি ওঝা না পাওয়া যায়, তাহলে এই জঙ্গলের বুকেই সনিকে রেখে যেতে হবে, ইহা কি কম দুঃখের কথা !

—সাত—

যে দু'জন কুলি নদীর জলে রুমাল ভেজাতে গিয়েছিল। তাদের একজন বললো—একটি মানুষ ভাসছে বাবু নদীর কিনারায়···

—মানুষ ?—ডেভিড অবাক হয়ে গিয়েছিল।

সরোজ বললো—আমার সঙ্গে যে মাঝিরা ছিল তাদেরই কেউ হয়তো—

—তোমার সঙ্গে মাঝিরা ছিল ? তুমি তাহলে জংলীদের হাতে ধরা পড়নি ?

—ধরা পড়েছিলুম, পালিয়ে এসেছি। সে অনেক কথা—এখন চল লোকটি বেঁচে আছে কিনা দেখিগে।

—চল—বলে দু'জনকে সনির কাছে বসিয়ে ডেভিড ও সরোজ নদীর তীরে গেল।

নদীর তীর বেশী দূর নয়। কয়েকটি গাছের আড়াল পার হয়ে নদীর

কিনারায় তারা এসে পৌছলো। দেখলো একটি লোক ভেসে এসে চরে লেগেছে, লোকটি এখনও বেঁচে আছে কিনা দেখবার জন্য একটু কাছে গেছে, সহসা মাঝারি আকারের একটি কুমীর ভেসে উঠে লোকটিকে টেনে নিয়ে জলে ডুবে গেল। এত তাড়াতাড়ি কুমীরটা জলে ডুবলো যে, ডেভিড একটা গুলি করবারও অবসর পেল না।

অনেকক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু আর কুমীরটা ভাসলো না।

ফিরে যাবার জন্য যেই পা বাড়িয়েছে অমনি একটি করুণ চীৎকার কানে এল, ক'জনে স্তব্ধ হয়ে গেল। সনিকে কি অন্য কোন কুলিকে কোন হিংস্র জানোয়ার আক্রমণ করলো নাকি ?

তাড়াতাড়ি দু'জনে ফিরে এল কিন্তু কই কিছুই তো হয় নি। তবে যারা গ্রামে গিয়েছিল তাদের কেউ নয়তো ?

যেদিক থেকে চীৎকার শোনা গিয়েছিল সেইদিকে সকলে চললো।

বেশীদূর যেতে হোল না। যখন তারা একটি ঝোপের পাশ দিয়ে চলেছে সহসা একটা ঝপ্ ঝপ্ শব্দ কানে এসে লাগলো, ডেভিড বন্দুক বাগিয়ে ধরলো। সরোজের বাঁ হাত জখম, পিস্তল ছাড়া তার বন্দুক ছুঁড়বার উপায় নাই। ফিরে দাঁড়াতেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল, যে একটা লোককে ভল্লুক জড়িয়ে ধরেছে, ভল্লুকের মিশ্ কালো লোমের ফাঁক দিয়ে মানুষটির একখানি হাত ও একটি পা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

গুড়ুম । গুড়ুম-! —ক্কড়াৎ ক্কড়াৎ—।

একজনের হাতের বন্দুক, আর একজনের পিস্তল একই সঙ্গে গর্জে উঠলো।

গুলি খেয়ে ভল্লুকটি মুখের শিকার ছেড়ে দিয়া ঘুরে দাঁড়ালো, 'হাউ হাউ' করে একটা চীৎকার করে এদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

– গুড়ুম—! ডেভিড আর একটি গুলি করলো।

—ক্কড়াৎ—। সরোজের পিস্তল আর একবার গর্জে উঠলো।

কিন্তু হিংস্র পশু তখন ক্ষেপে উঠেছে, কোন বাধাই সে মানলো না। প্রথমে তো এক থাবা মেরে ডেভিডের হাতের বন্দুক সে ফেলে দিল, তার পরেই ডেভিডের উপর লাফিয়ে পড়লো। ডেভিড চট করে সরে না দাঁড়ালে সে যাত্রা তার রক্ষা পাওয়া মুস্কিল হোত। ঠিক সেই ফাঁকে যে লোকটিকে এতক্ষণ ভল্লুক জড়িয়ে ধরেছিল তার একখানি টাঙ্গি পড়ে ছিল সেটি কুড়িয়ে ভল্লুকটির মাথায় সে

এক ঘা বসিয়ে দিল। ভল্লুকের মাথার মধ্যে ধারালো টাঙ্গি বসে গেল, পরমুহূর্তে ঘুরে পড়ে ভল্লুকটি স্থির হ'য়ে গেল।



লোকটি নাড়াচাড়া করে একবার দেখে, তখনি ভল্লুকটির চামড়া ছাড়াতে বসে গেল, তার সারা দেহ থেকে তখন রক্ত ঝড়ছিল।

সরোজ বললো—অতো কাছ থেকে গুলি করা তোমার অন্যায় হয়েছিল, যাক্ খুব বেঁচে গেছ।

চামড়া ছাড়ানো বন্ধ করে লোকটি মুখ তুললো, আসামী ভাষার সঙ্গে বাংলা মিশিয়ে বললো—আপনারা আজ আমায় খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন সাহেব—

হাফ্ প্যাণ্ট পরা ডেভিডকে সে সাহেব ভেবেছিল।

ডেভিড হেসে বললো—তুমিও তো আমায় বাঁচিয়েছ, শোধ-বোধ হয়ে গেছে—

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো—সাহেব কি বনের কাজ করেন, না শিকারী?

সরোজ জবাব দিল—বনের কাজেই এসেছিলুম, এসে বিপদে পড়ে গেছি—

—কি হয়েছে।

— আমাদের এক সঙ্গীকে সাপে কামড়েছে।

—সাপে কামড়েছে ? কতক্ষণ ?

—শেষ রাত্রে।

—চলুন তো দেখি।

—ওষুধ জান নাকি ?

—জানিতো হুজুর, না দেখে বলতে পারি না।

লোকটি সনিকে এসে দেখলো, বললো - বোধ হয় বাঁচবে। তা এতক্ষণ কামড়েছে আর আপনারা চুপ করে বসে আছেন ?

—গাঁয়ে লোক পাঠিয়েছি, ওঝার খোঁজে—

—ওই হোথায় - ওই গাঁয়ে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

— ওখানকার ওঝা তো আমরাই। যাক, ভালই হয়েছে দেখি একবার চেষ্টা করে। এই ফাঁকে আপনার একটা লোক দিয়ে ওই ভল্লুকের চামড়াটি ছাড়াবার ব্যবস্থা করুন তো—

একজন কুলির উপর চামড়া ছাড়াবার ভার দিয়ে লোকটি একটা ওষুধ খুঁজে আনবার জন্য জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল।

মিনিট পোনেরোর মধ্যে সে ফিরলো হাতে তার একটা কিসের শিকড় আর একটি পাথরের টুকরো, জল দিয়ে শিকড়টিকে সে পাথরের উপর ঘসতে লাগলো। খানিকক্ষণ ঘসবার পর চন্দনের মত খানিকটা ক্বাথ জমলে সেই ক্বাথ সনির কানে, নাকে ও কপালে লেপে দিল। তারপর সাপ যেখানে কামড়েছিল সেইখানে মুখ দিয়ে সে রক্ত চুষতে লাগলো। এক মুখ ভরে রক্ত চোষে আর ফেলে দেয়। তারপর আবার চোষে। রক্ত চুষে চুষে সনির নীল হাতখানা যখন একটু ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে বলে মনে হোল তখন সেই ক্ষত স্থানে শিকড়ের বাকী ক্বাথটুকু লেপে দিয়ে লোকটি উঠে পড়লো, বললো—মাথা অবিরাম জল দিয়ে ধোয়াতে থাকুন, দু'দণ্ডের মধ্যে সেরে উঠবে বলে মনে হয়।

তারপর সরোজের পানে ফিরে বললো, - আপনার ওই হাতখানা অত ফুলেছে কেন দেখি—

সরোজ হেসে বললো—আগে একটাকে সারাও তারপর দুটো।

—ওতো সারবেই আপনারটা ততক্ষণ দেখি,—বলে লোকটি সরোজের বাঁ হাতটি কাঁধের উপর উঠিয়ে নিয়ে সেই শিকড়টা বুলিয়ে বুলিয়ে কি সব মন্ত্র পড়তে লাগলো। সরোজের মনে হোল ক্রমে ক্রমে যেন ব্যথা আরাম হচ্ছে, কতকক্ষণ পরে হাতখানি ছেড়ে দিয়ে বললো - সেরে গেছে, দু' দণ্ড জলে ভিজিয়ে রাখুন—

শিক্ষিত বাঙ্গালীর ছেলে এই সব মন্ত্র-তন্ত্র ও শিকড়ে বিশ্বাসও করতে পারে না। আবার আশাও ছাড়তে পারে না। দুদিকে জল চললো—একজনের মাথায় আরেক জনের হাতে। শেষে তো কুলিরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লো।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো—আর কতক্ষণ জল দিতে হবে ?

লোকটি বললো - দু'দণ্ড তো হয়নি বাবু এখনও।

– দু'দণ্ড মানে ?

সরোজ জবাব দিল দু'দণ্ড মানে আটচল্লিশ মিনিট, চব্বিশ মিনিটে এক দণ্ড।

— বেশ, আমার কোন আপত্তি নাই, আর কতক্ষণই বা বাকি! আমি কিন্তু এ সব বিশ্বাস করি না।

সরোজ বললো—বিশ্বাস আমিও করিনা কিন্তু এখন সব কিছুই বিশ্বাস করতে হচ্ছে—

লোকটি এবার বললো—এখনি বিশ্বাস হবে বাবু, দেখুন না।

সত্যই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হোল।

সরোজের হাতের ফুলো কোথায় চলে গেল, হাত নিয়ে সে বেশ স্বচ্ছন্দে নাড়াচাড়া করতে লাগলো, সনিও ধীরে ধীরে চোখ মেললো।

কৃতজ্ঞতায় সরোজ বললো - তোমায় ভাই কি দিয়ে খুসী করবো তাতো ভেবে পাচ্ছি না। এখন তো আমাদের কাছে দেবার মত কিছুই নেই।

ওঝা (এখন থেকে লোকটিকে আমরা ওঝাই বলবো) বিনীত ভাবে বললো—কিছু দিতে হবে না, আমার গুরুর আদেশ - কিছু নিতে নেই। আর আমি তো কিছু করিনি গাছ-গাছড়া জানি খুঁজে এনে দিলুম এই পর্যন্ত।

লোকটির বিনয় দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলো - খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন এখানেই হবে নাকি ?

—খাওয়া-দাওয়া আর কি ? ডিম সিদ্ধ করবো আর চা করবো।

—তার চেয়ে চলুন বাবু আমাদের গাঁয়ে—আপনাদের মত লোকের পদধূলি পড়লে গাঁ ধন্য হয়ে যাবে !

এই বলে লোকটি এমন ধরে বসলো যে, কোন ওজর-আপত্তি টিঁকলো না। গ্রামে যে দু'জনকে পাঠানো হয়েছিল, তারা তখন ফিরে এসেছে।

সনি উঠে বসেছে। জিনিষ-পত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে সনিকে ধরে দুই বন্ধুতে অগ্রসর হোল, ওঝা আগে আগে পথ দেখিয়ে চললো।

ওঝা অমায়িক। ভাল করে খাইয়ে যত্ন করে কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পাচ্ছে না, অথচ তার এতটুকু স্বার্থ নাই, বর্তমান যুগে শুধু ভারতবর্ষেই অমন অতিথি সেবা সম্ভব।

এদিকে সারা গ্রামের বুকে হৈ চৈ পড়ে গেছে—ওঝাদের বাড়ীতে সাহেব এসেছে।

ক' ঘরই বা লোকের বাস। সকলেই ভীড় করে দেখতে এসেছিল, ওঝার ধমক খেয়ে যে যার সরে পড়লো।

ওঝা বললো—বাবুরা দু'দিন এখানে থাকুন, কোন কষ্ট হবে না।

সরোজ বললো—থাকার উপায় সেই ভাই, বিশেষ জরুরী কাজ।

– এই জঙ্গলের মধ্যে জরুরী কাজ ?

—হ্যাঁ! তবে শোন—বলে সরোজ উমানন্দ ভৈরব হতে ফিরে আসা থেকে আরম্ভ করে বুনো হাতীর গাছের মাথায় ছুঁড়ে দেওয়া পর্যন্ত সকল কথা বললো।

সব কথা শুনে ওঝা বললো—বুঝেছি সাহেব, আমরা জানি। ওরা যে যকের পূজো করে, পূর্ণিমার রাত্রে যক দেবতার কাছে মানুষ উৎসর্গ করে ভল্লুক দিয়ে খাওয়ায়।

—কি রকম ?

—আসুন বাহিরে দেখাচ্ছি - বলে তিন বন্ধুকে ওঝা বাহিরে নিয়ে এলো - ওই পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন—ওই যে অনেক ঘরবাড়ী দেখা যাচ্ছে ?

—হঁ্যা।

—ওইটি আবাংদের গ্রাম। আর তার পাশে ওই যে একটা হাতীর পিঠের মত পাহাড় দেখছেন, ওরই ওপাশে জমুদের বসতি। ওই পাহাড়টীর নীচেই একটা মন্দির আছে, সেইখানেই যকের পূজা হয়। আর মন্দিরের একটু

নীচে পাহাড়ের এক গর্তের মধ্যে অনেক ভল্লুক পোষা আছে, তাদের মাঝে মানুষগুলোকে ফেলে দিয়ে ওরা মজা দেখে। ভল্লুকগুলো মানুষগুলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় আর ওরা উপরে দাঁড়িয়ে দেখে আর হাততালি দেয়। ওদের মুখ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনা ভারী শক্ত কথা বাবু !

—আমাদের এই আগুন-যন্ত্রের গুণ দেখেছ ?

—হ্যাঁ বাবু, ওতে আপনাদের বিশেষ সুবিধা হবে না। ওদের এক রকম ছোট ছোট বর্শা আছে, বাঁশেতে ভরে কৌশলে ছুঁড়ে মারে, একবার লাগলে তার বিষে তখনি মৃত্যু।

—মরতে হয় মরবো কিন্তু তা বলে দু'জন বন্ধুকে মরণের মুখে ফেলে পালাতে পারবো না।

—নিশ্চয় বাবু, নইলে বন্ধু কিসের—তা বাবু আপনারা তাদের রক্ষা করতে পারবেন, আপনাদের সাহস আছে—

যাক্ ওঝার সঙ্গে আর বেশীক্ষণ গল্প-গুজব না করে তারা যাবার জন্য তৈরী হোল। ওঝা বললো—এখনি যাবেন বাবু, কাল রাতে ঘুমাতে পাননি, একটু ঘুমিয়ে নিন্ না—

কিন্তু ঘুমাতে কেউ রাজী হোল না। নেপোলিয়ন রাত্রে মাত্র এক ঘণ্টা করে ঘোড়ার পিঠে ঘুমিয়ে বছরের পর বছর ধরে দিগ্বিজয় করে ফিরেছেন। আর তাদের দু' এক দিন না ঘুমালে কি এমন ক্ষতি হবে। ওঝার কাছ থেকে সহজ ও সোজা একটী পথ জেনে নিয়ে সকলে বাহির হয়ে পড়লো। বিদায় দেবার সময় ওঝা বললো—ফেরবার পথে আমাদের এখানে হয়ে যাবেন কিন্তু, ভুলবেন না যেন। হাজার হোক্ আপনারা আমার জীবন-দাতা।

সনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল। জ্ঞান ফিরে আসলে ওঝা তাকে কি কয়েকটি গাছের পাতা খাইয়ে একেবারে চাঙ্গা করে তুললো। ওঝার কথার উত্তরে হেসে সে বললো—আপনি বুঝি কারুর জীবন বাঁচান নি ?

ওঝা হাসলো। তার সঙ্গে আর সকলে হেসে বিদায় নিল।

আবার দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে পথ চলা সুরু হোল।

ওঝার ঘরের সামনে থেকে আবাংদের গ্রামটি যতটা দূরে দেখিয়েছিল, পথ চলতে গিয়ে কিন্তু আরো দূর বলে মনে হোল।

পথ যেন আর ফুরাতে চায় না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলো পথের মাঝেই।

ডেভিড বললো—হোক্ রাত্তির মশাল জ্বেলে চলবো। আজ ওখানে না পৌছে আর জিরোবো না।

সরোজ বললো—বেশ, চলো আমার কোন আপত্তি নেই।

আগে আর পিছে দুটি মশাল নিয়ে অগ্রসর হোল। চলতে চলতে শেষে ব্যাথায় পায়ের শিরাগুলি টেনে ধরে, জুতার মধ্যে পায়ের আঙুলগুলি টনটন করতে থাকে। তথাপি বিরাম নাই, চলছে তো চলেছেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন রাত দু' প্রহর হয়েছে।

সহসা তাদের সামনের পথে অন্ধকারের বুকে মশালের আলো জ্বলে উঠলো।

দূরে পাহাড়ের গা বহে একটির পর একটি মশালের সারি নেমে আসছে। কখন মশালগুলো গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ছে, আবার কখন ঘুঁড়ির-সুতোয়-বাঁধা একসারি ফানুসের মত চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ক্রমে ক্রমে আলো কাছে এসে পড়লো, স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল জন পোনেরো বর্শাধারীকে নিয়ে মাথায় লাল-পাগড়ী-বাঁধা একটি লোক আগিয়ে আসছে। সরোজ দেখেই চিনলো আবাং সর্দার। সরোজকে পেয়ে সর্দারের তো আর আনন্দ ধরে না, বললো—আসুন, আমরা আপনাদের এগিয়ে আনতেই এসেছি।

সরোজ বললো—যাক্ ভালই হয়েছে, আমরা মনে করেছিলুম আরো কতদূর!

—দূর এখনও অনেকটা তবে সামনেই একটি ছোট খাদ আছে, তার মধ্যে দিয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি পৌছানো যাবে।

—কিন্তু আপনাদের যখন দেখা পেয়ে গেছি তখন আমরা খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে পারি। সেই বিকাল থেকে হাঁটছি এখনও বসিনি—

—বেশ আপনারা বিশ্রাম করুন, রাত তো আর বেশী নেই সকালের দিকে যাত্রা করা যাবে—

সর্দারের উপদেশ মত কাছাকাছি খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখে পরিষ্কার করে নিয়ে পাঁচজন কুলি আর তিনবন্ধু শুয়ে পড়লো।

এত পরিশ্রম। শুতে না শুতেই ঘুম।

—আট—

সহসা হাততালির শব্দে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সকলে চমকে উঠে চোখ খুলে দেখে জনকতক লোক বর্শা আর লোহার ভাটি নিয়ে সেইদিকে আসছে। আবাং সর্দারের মুখতো এতটুকু হয়ে গেল। সর্দারের অনুচরদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল—জমুরা আসছে!

জমুদের সরোজ চিনতো, বললো – জমুরা আসছে তো ভয় পাবার কি আছে? আমরা তো তৈরী! সর্দার আপনাদের অনুচরদের বলুন ঢাল নিয়ে আমাদের সামনে রক্ষা করতে, তারপর আমরা দেখছি –

সর্দারের নির্দেশ মত ঢালগুলি সামনে রেখে তার পিছনে সকলে এসে দাঁড়ালো। কুলিগুলো তো রীতিমত কাঁপছে কিন্তু তিনবন্ধু অচল অটল। হাতে বন্দুক নিয়ে তারা শুধু সুযোগের অপেক্ষা করছে।

জমুরা কাছে এলো।

সরোজ বললো—আগেই গুলি করবার দরকার নেই শুধু ভয় দেখাও।

একটি লোক সামনে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল ডেভিড তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—ওই সর্দার বুঝি?

—হ্যাঁ—সরোজ মাথা নাড়লো।

সেই মুহূর্তে ডেভিডের হাতের বন্দুক গর্জে উঠলো! অব্যর্থ লক্ষ্য, সর্দারের টাট্টু ঘোড়াটি একবার সামনের দিকে দু'পায়ে লাফিয়ে উঠে মাটির উপর পড়ে গেল আর উঠলো না। ঠিক সময়ে লাফিয়ে না পড়লে সর্দারের পা জখম হোত নিশ্চয়ই।

জমুরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন হবে তারা আশা করে নি।

ওই একটি গুলিতেই কাজ হোল।

—জমু সর্দার দু' হাত মাথার উপর তুলে সরোজদের থামতে বলে দল ছেড়ে এগিয়ে এলো। কাছে এসে বললো—ওগো বাঙ্গালী, তোমাদের অস্ত্র খুব ভাল তা আমরা জানি। তোমাদের ওই একটি অস্ত্রে আমাদের হয়তো সব লোক মারা পড়বে, কিন্তু ওতে তো আর শক্তির পরীক্ষা হবে না। তোমাদের সঙ্গে হাতাহাতি করে শক্তির পরীক্ষা করতে চাই, হয় মল্লযুদ্ধে এস নাহলে তলোয়ার?

ডেভিড বললো—আমরা যখন লড়বো সেই ফাঁকে তোমার লোকেরা আমাদের ধরে নিয়ে বন্দী করে ফেলুক!

জমু সর্দার হেসে বললো—দেখুন জমুরা প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখতে জানে, আবশ্যক হলে প্রাণ দিয়েও।

ডেভিড বললো—বেশ তবে ঘুষোঘুষি লড়বে তো এসে?

জমু সর্দার বললো—ওতো আমরা কখনও লড়িনা, ও তো জানিনা। আর ওতে দেহের শক্তির পরিচয় তো পাওয়া যাবে না, শুধু হাতের কায়দা! ও নয়, আমি চাই তলোয়ার নাহলে মল্লযুদ্ধ।

ডেভিড বকসিং জানিতো বলে সে প্রথমে কথা কয়েছিল, তলোয়ার বা কুস্তি সে কোন কালে শেখে নি। তার উপর সে ছাড়া আর কেই-বা লড়বে? আবাং সর্দার তো কাঁপছে বললেই হয়, আর সনির কথা তো বাদ, তার উপর সরোজের একটা হাত দুর্বল, কাজেই লড়বে বললে এখন ডেভিডকেই লড়তে হবে। ডেভিড বললো - কিন্তু তলোয়ার কি কুস্তি তো আমি জানিনা।

জমু সর্দার হাসলো, বললো—আপনার দলে আপনি ছাড়া আর লোক নেই নাকি?

ডেভিড বললো - আছে, আরো দু'জন আছে। তবে তাদের একজনকে কাল রাত্রে সাপে কামড়েছিল, এখনও ভালরকম সুস্থ হয় নাই। আর একজন কাল রাত্রে বুনোহাতীর সঙ্গে লড়ে বাঁ হাতখানি জখম করে ফেলেছে—

জমু সর্দার বললো - তার মানে আমার সঙ্গে লড়ার সাহস আপনাদের কার নেই। শুধু ভাল ভাল কৌশলী অস্ত্রের জোরেই আপনারা সাহস দেখান। নইলে ডান হাতে তলোয়ার চালাবে তো বাঁ হাতের কি?

সরোজ এইবার কথা বললো—ঠিক কথা, তবে কি জান সর্দার, বাঙ্গালীরা বাঁ হাতেও তলোয়ার চালাতে জানে।

—একটু এসে দেখিয়ে দিন না দেখি—বলে সর্দার হি হি করে উপহাসের হাসি হাসলো।

সে উপহাস সরোজ সইতে পারলো না, আগিয়ে গিয়ে বললো—তলোয়ার দাও সর্দার, দেখাচ্ছি—

জমু সর্দার নিজের কোমরে যে তলোয়ারখানি ঝুলছিল, তা খুলে দিল। সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কিসে লড়বে সর্দার?

জমু সর্দার বললো—আগে তোমার বাঁ হাতের তলোয়ার খেলা দেখে তারপর লড়বো।

সরোজ বললো—খেলা দেখাতে আসিনি সর্দার, আমি এসেছি লড়তে, এই বাঁ হাতেই আমি তোমার সঙ্গে লড়বো—

—বেশ—বলে জমু সর্দার একটি অনুচরকে ইসারা করতেই সে আরেকখানি তলোয়ার এনে সর্দারের হাতে দিল।

সেলামী দিয়া লড়াই স্থরু হোল।

একজনের ডান হাতে তলোয়ার, আরেকজনের বাঁ হাতে।



একজন সুস্থ সবল, আরেকজন সারা রাত পথ চলে শ্রান্ত, তার উপর আহত বাঁ হাত সবে মাত্র সেরেছে। কিন্তু তার জন্য কি? ত্ু'জনের কেহই কম যায় না।

তলোয়ার ঝিক্‌মিক্ করছে আঘাতে প্রতিঘাতে আগুন ঠিকরে উঠছে, একটু উনিশ-বিশ হলেই এখুনি একজনের মাথা দেহ থেকে ছিটকে দূরে গিয়া পড়বে। কিন্তু আশ্চর্য, ত্ু'জনের মধ্যে কেউ কম নয়······

সহসা দু'জনের কব্জিতে তলোয়ার বেধে গেল।

সঙ্গীন মুহূর্ত! যার কব্জির জোর কম, যে একটু পিছিয়ে যাবে, তাকেই আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হবে।

সরোজ পিছু হটছে···

ডেভিড ও সনির দৃষ্টি ভয়ে ঝাপ্‌সা হয়ে আসতে লাগলো। সরোজ বুঝি আর রক্ষা পেল না!

ডেভিড পিস্তল টিপে ধরে বললো—দরকার হলে আমি জমু সর্দারকে কুকুরের মত গুলি করে মারবো।

সনি বললো—কিন্তু···

ডেভিড বললো—কিন্তু ফিন্তু বুঝিনে। আমার বন্ধু আহত হলে আমি তার শোধ নেব। কারুর কথাই শুনবো না।

ঠিক সেই মুহূর্তে জমুসর্দার সরোজকে ঠেলে দিয়া তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লো। চকিতে সরোজ সরে গিয়া দাঁড়াল। নিজের বেগ সামলাতে না পেরে জমুসর্দার পড়ে যাবার উপক্রম হোল আর ঠিক সেই মুহূর্তে সরোজ ঘুরে দাঁড়িয়ে তলোয়ার শুদ্ধ জমুসর্দারের ডান হাতের কব্জি চেপে ধরলো। জমুসর্দারের পরাজয় ঘটলো।

সরোজ বললো - সর্দার, এবার যদি আমি তোমায় বন্দী করি—তোমার দলের লোকেরা যেমন ভীরু কাপুরুষের মত আমাদের বন্দী করেছিল?

জমু সর্দার মুখ তুলে চাইতে পারলো না।

সরোজ তলোয়ারখানি কেড়ে নিয়ে হেসে বললো—যাও সর্দার, তোমায় বন্দী করলুম না। তোমার সমস্ত দলের সঙ্গে আমরা শক্তি পরীক্ষা করতে এসেছি তোমার একার সঙ্গে নয়। আমরা তোমাদের মত ভীরু কাপুরুষও নই যে সুবিধা পেয়ে তোমাদের বন্দী করবো, বুঝলে? যাও···

সর্দার মুখ নীচু করে চলে গেল।

সনি বললো—আপনি এতো ভাল তলোয়ার খেলতে জানেন তাতে জানতুম না।

সরোজ হাসলো, বললো—শিখেছিলুম গত জার্মাণ যুদ্ধের সময় যুদ্ধে যাবার আগে। দেশের চারিদিকে তখন লাঠি ছোরা তলোয়ার যুযুৎসু শেখার ধুম পড়েছিল। সেই সময় পুলিনবিহারী দাসের এক ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ

হয়। তার কাছ থেকে আমি তলোয়ার-খেলা শিখি, আজ সেই শিক্ষা আমার কাজে লেগে গেল।

বাংলার নামকরা লাঠিয়াল পুলিনবিহারী দাসের নাম সনির কাছে অজানা ছিল না। সনি বললো—যাক্, আমায় শেখাতে হবে কিন্তু ?

সরোজ হাসলো, বললো—সেকথা পরে, এখন সর্দারকে বল, কিছু ফলমূল যোগাড় করতে, খেয়ে তো আবার যেতে হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফলমূল এলো। জলযোগ সেরে যাত্রা করতে তাদের বেশী দেরী হোল না।

—নয়—

পাহাড়ের মাথায় ছোট একটি সহর। ঠিক সহর বললে ভুল হবে, একটি বড় গ্রাম। একটি ছোট কেল্লা যেন। চারিপাশের বন ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। চারিদিকে দৃষ্টি চলে বহুদূর পর্যন্ত।

কিন্তু চারিপাশে দেখবার মত মন তখন তাদের নয়, ভাল করে আহারাদি করে একটু শুতে পারলে তারা বাঁচে।

আবাংসর্দারের বাড়ীতে সকলে গিয়ে উঠলো।

ঝর্ণার জলে স্নান করে পেট ভরে ফলমূল ও দুধ খেয়ে দিব্যি আরামে নরম বিছানায় তিনবন্ধু দেহ এলিয়ে দিল।

ঘুম ভাঙ্গতেই, একটি লোক এসে জানালো—সর্দার আপনাদের সভায় যাবার জন্য ডাকছেন।

সর্দারের নাম করে লোকটি তাদের যেখানে ডেকে নিয়ে এলো সেটা রীতিমত একটা সভা বললেই হয়। মাঠের মধ্যে একটা উঁচু ঢিবির উপর আবাংসর্দার বসেছে আর তার সামনে জমা হয়েছে গাঁয়ের যত লোক।

সরোজ, ডেভিড ও সনি যেতেই সর্দার উঠে দাঁড়ালো, আবাংদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বললো,—এই তিনজনের কথাইব লেছিলুম, এঁরা তিনজন বাঙ্গালী শিকারী, এঁদের দু'জন বন্ধুকে জমুরা আটকে রেখেছে, তাদের উদ্ধার করার জন্য এঁরা আমাদের সাহায্য চাইছেন, তোমরা সকলে এঁদের সাহায্য করতে রাজী আছ ?

আবাংরা ভীরুর মত পরস্পরের মুখের পানে তাকাতে লাগলো। সর্দার বুঝতে পারলো, বললো—ভয়ের কোন কারণ নেই, তোমাদের লড়াই করতে হবে না। কেননা এঁদের কাছে এমন সব অস্ত্রশস্ত্র আছে যে জমুদের দু'তিনটে গ্রাম খুব সহজেই হাওয়ায় মিশিয়ে দেওয়া যায়, কাজেই এঁরা লড়বার জন্য লোক চান না, চান আমাদের বন্ধুত্ব। এঁদের বন্ধুত্ব আমি স্বীকার করেছি কেননা জমুরা আমাদের প্রতিবেশী শত্রু, তাদের তাড়িয়ে দিতে না পারলে আমাদের উন্নতি নেই। এই তিনজন বাঙ্গালী তাদের তাড়িয়ে দেবার ভার নিয়েছেন। এঁদের বন্ধু বলে স্বীকার করিতে কি তোমাদের কোন আপত্তি আছে ?

এবার সকলে মাথা নেড়ে জানালো—না, আপত্তি নেই।

—তাহলে তোমরা এঁদের সাহায্য করতে রাজী আছ ?

– হ্যাঁ।

সহসা জনতার মধ্যে থেকে একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো, বললো – ওদের যে অস্ত্রশস্ত্রের কথা বললেন সর্দার, আমরা আগে তার একটু পরিচয় পেতে চাই –

সর্দার বন্ধু তিনজনের মুখের পানে তাকালো।

সরোজ বললো—বেশ, এই দণ্ডেই আমরা পরিচয় দিচ্ছি।

তিনজনে ফিরে গেল তাদের সেই ঘরে। একটা বন্দুক ও প্যাকিং বাক্স খুলে সামান্য ডিনামাইট নিয়ে এলো। সকলের সামনে সরোজ বন্দুকটা কাঁধের উপর তুলে নিল। আকাশে উঁচুতে সারি সারি বক উড়ছিল তাদেরই একটাকে লক্ষ্য করে সরোজ বন্দুকের ঘোড়া টিপলো, দুড়ুম করে শব্দ হতে-না-হতেই লট্‌পট্ করতে করতে রক্তাক্ত একটি বক মাটির উপর এসে পড়লো। তারপর খানিকটা দূরে পাহাড়ের একটি খাঁজের মধ্যে ডিনামাইট্‌টুকু রেখে পলিতাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এল। ছোট পলিতা পুড়তে কতক্ষণ-বা লাগে। বিরাট শব্দ হয়ে চারিপাশ কাঁপিয়ে পাহাড়ের খানিকটা ধ্বসে পড়লো, তুবড়ীর মত পাথরের কুচিগুলি চারিপাশে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো।

আবাংরা ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ।

সর্দার বললো—এইসব অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ওরা জমুদের গ্রাম ধ্বংস করবে। ওদের দু'জন বন্ধুকে উদ্ধার করবে আর আমার মেয়েকেও বাঁচিয়ে আনবে ওদের হাত থেকে। আমি তাই কথা দিয়েছি সব রকমে আমি ওদের সাহায্য করবো, আমার মেয়েকে আমার ফিরে পাওয়া চাই-ই।

সকলে চুপ করে রইল।

সর্দার এবার বন্ধু তিনজনের পানে ফিরে বললো—কবে থেকে স্বরু হবে ?

—আজই হতে পারে, তবে তার আগে জমুদের সব গুপ্ত খবর আমাদের চাই। আমাদের বন্ধুরা কি অবস্থায় আছে, কোথায় আছে, সব জানতে হবে তো ?

—বেশ আমি এখনি দু'জন গুপ্তচর পাঠাচ্ছি—বলে সর্দার দু'জন লোককে ডেকে কি উপদেশ দিল।

তারপর সেদিনকার মত সভা ভাঙ্গলো।

জন পাঁচেক আবাং গল্প করতে করতে সভা হতে বাড়ী ফিরছিল সহসা পাশ দিয়ে একটি লোককে চলে যেতে দেখে, তারা চমকে উঠলো। লোকটি একেবারেই অপরিচিত। যে রকম তাড়াতাড়ি সরে পড়ছে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়।

কি ভেবে একজন তাকে ডাকলো—ওহে, শোন—

লোকটি একবার মুখ ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখলো, তারপরই তীরের মত বনের দিকে ছুটলো।

পাঁচটি লোকের সঙ্গে একটা লোক কখনও ছুটে পারে ? পাঁচজন হৈ হৈ করে তার পিছনে ছুটে গিয়া তাকে ধরে ফেললো।

লোকটি জমুদের গুপ্তচর।

ধরা পড়েই তো সে সর্দারের পায়ে কেঁদে পড়লো -দোহাই সর্দার, প্রাণে মারবেন না, আপনাদের আমি অনেক উপকার করবো।—

—কী উপকার করবে শুনি ?

—আপনার মেয়েকে উদ্ধার করার পথ আমি বলে দেব। তাদের তো আর দু'তিন দিনের মধ্যে ভল্লুকের মুখে ফেলে দেওয়া হবে, এখনও তাদের বাঁচালে বাঁচাতে পারা যায়। গুপ্ত পথ আমি জানি।

—বেশ, কালই তোমার সঙ্গে আমরা যাব, বিশ্বাসঘাতকতা করলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ মৃত্যু !

লোকটিকে সেদিনকার মত আটকে রাখা হোল।

পরদিন কয়েকজন লোক, আর কয়েকটি দরকারী জিনিষপত্র নিয়ে আবাং সর্দার গুপ্তচরের সঙ্গে পথে বাহির হয়ে পড়লো।

সরোজ সনি ডেভিডও তাদের সঙ্গে ছিল। ঘন গভীর জঙ্গল দিয়ে গুপ্তচর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

পাহাড়ের প্রায় নীচে নেমে এসে একটী ঝোপের পাশ থেকে সে একখানি পাথর সরিয়ে ফেললো। পাথরটী সরাতে নীচে একটী গর্ত দেখা গেল, গুপ্তচর বললো—এই পথ—

সরোজ বললো—বেশ, তুমি আগে আগে চল, আমি পিছনে আছি।

গুপ্তচর হাসলো, হেসে হাতের মশালটী জেলে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথের মধ্যে প্রবেশ করলো।

—দশ—

অনেক দিনের পুরানো পথ। অন্ধকার, অমন দিনের আলোতেও অন্ধকার। কে যে সখ করে পাহাড়ের বুকে এমন পথ করেছিল কে জানে। চলতে কষ্ট হয়। কখন উঠে, কখন নেমে, আগাছা ডিঙ্গিয়ে, সাবধানে পা ফেলে ধীরে ধীরে সকলে অগ্রসর হতে লাগলো। কতদিন যে সেপথে লোক চলে নি, তা সেই পথই বলতে পারে!

সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে এক খাদের পাশে এসে। খাদের ওপাশে একটী প্রকাণ্ড পাথরের ঢিবি দেখা যাচ্ছে।

ঢিবিটা দেখিয়ে গুপ্তচর বললো—ওই হচ্ছে জমুদের জেলখানা, ওর ভিতরে আবাং সর্দারের মেয়েটিকে আর বাঙ্গালী দু'জনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

সরোজ বললো—তাতো বুঝলাম কিন্তু তাদের উদ্ধার করবো কেমন করে?

—ওটা হচ্ছে জেলখানার ছাদ, সন্ধ্যার সময় বন্দীরা ওই ছাদে হাওয়া খায়, সেই সময় তাদের নিয়ে আসতে হবে।

—কিন্তু এই খাদের ওপারে যাব কেমন করে?

—ওই জন্যই তো দড়ি আর মই সঙ্গে করে আনা হোল। সব মইগুলো একটির পর একটি লম্বা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলুন, তারপর সেই মইটি এদিক থেকে ওদিকে ফেলে দিন, খাদের এদিকে মইয়ের একটি মুখ থাকবে, আর ওই ঢিবিটির মাথায় আর একটি মুখ থাকবে, তারপর সেই মই ধরে ঢিবির উপর গিয়ে

আপনারা চুপ করে অপেক্ষা করবেন। সন্ধ্যার সময় বন্দীরা উপরে উঠলেই তাদের নিয়ে পালিয়ে আসবেন।

—পাহারা থাকে না ?

—থাকে ; তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবেন। তার উপর আপনাদের কাছে তো আগুন-ছোঁড়া অস্ত্র আছে, আপনাদের সামনে তারা কতক্ষণ দাঁড়াবে ?

সরোজ বললো—বেশ, কিন্তু কে কে যাবে ?

ডেভিড বললো—আমি যাব—

সনি বললো—আমি যাব—

সরোজ বললো—বেশ, আর সর্দার চলুন—

কিন্তু সর্দার তখন রীতিমত ঘাব্‌ড়ে গেছে, বললো – তাইতো, তাইতো, এত সরু মইয়ের উপর দিয়া খাদের ওপাশে যাওয়া···যদি পড়ে যাই।

সর্দারের ভাব দেখে সনি তো আর হেসে বাঁচে না।

সরোজও হেসে ফেললো, বললো—বেশ বেশ, আপনাকে যেতে হবে না, আপনি এখানেই থাকুন।

ইতিমধ্যে মইগুলি লম্বা করে বাঁধা হোল। প্রকাণ্ড লম্বা মইখানি ধীরে ধীরে খাদের ওদিকে পাহাড়ের ঢিবির উপর ফেলে দেওয়া হোল। সরোজ ও ডেভিড মই বহে ওদিকে যাবার আগে সনির হাতে বন্দুক দিয়ে বললো—এখানে পাহারা থাক, যদি কেউ সহসা আমাদের আক্রমণ করে, আর আমরা তাকে সুবিধা করতে না পারি তাহলে গুলি চালাবে—বুঝলে ?

সনি ঘাড় নাড়লো।

দুই বন্ধু পর পর মইয়ের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে একটির পর একটি করে সিঁড়ি পার হয়ে চললো। দুটি মানুষের দেহের ভরে বাঁশ মচ্‌মচ্‌ করতে লাগলো। নীচে অনন্ত অন্ধকার খাদ। একবার যদি মইয়ের বাঁধন খুলে যায়, কিম্বা যদি মইটা উল্টে ঘুরে যায়, তাহলে নীচে—কত নীচে কোথায় গিয়া যে পড়বে কে জানে! পাথরের বুকে আছড়ে গুঁড়ো হয়ে কিভাবে যে মরবে তা ভাবতে গেলেও মাথার মধ্যে শিরশির করে ওঠে।

কিন্তু ভয় পাবার ছেলে তারা নয়।

ওপারে পাহাড়ের মাথায় গিয়া যখন দু'জনে পৌছলো, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। অস্ত যাওয়া সূর্যের লাল কিরণ গায়ে মেখে দুটি লোক ধীরে

ধীরে পাহাড়ের মাথায় এসে দেখা দিল। তাদের সঙ্গে দু'জন রক্ষী। পিছনে একটি মেয়েও এসে উঠলো। রক্ষী দু'জন এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারী করতে লাগলো, বন্দী দু'জন পাথরের একটি ঢিবির উপর বসলো, মেয়েটি এসে দাঁড়ালো তাদের পাশে। ইতিমধ্যে বন্দীদের একজন গান ধরলো ঃ

'আমার সোনার বাংলা মাগো, আমি তোমায় ভালবাসি—

তোমার মুখের শ্যামল হাসি
যায় কি ভোলা, অবিনাশী,
পরশলোভী তাইতো আমি তোমার বুকে ফিরে আসি
আকাশ ভরা মেঘের মায়ায়
তোমার মাটি সোনা ফলায়
জ্যোছ্‌না ধারায় আশীষ ছড়ায় গো

দুই বন্ধু ক্ষণেকের জন্য নিজেদের কাজ ভুলে গান শুনে নিল।

সরোজ বললো—ডাক্তার গাইছে—

ডেভিড বললো—চমৎকার গলা—

সত্যই সুন্দর গাইবার ক্ষমতা। সুরে সুরে চারিপাশের আকাশ বাতাস যেন কেঁপে কেঁপে মনে ধাক্কা দিয়ে যায়, ফুলের গন্ধের চেয়ে এই গানের সুর ভাল লাগে, মনে হয় শুধু বসে বসে শুনি।

ডাক্তার তখন গাইছে ঃ

মায়ের আঁচল ছায়ার স্বপন দেখি হেথায় আমি পরবাসী
আমার সোণার বাংলা মাগো আমি তোমায় ভালবাসি—

সহসা ডেভিড সরোজের একটি হাত ধরে চাপা গলায় বললো—Get ready!

সুরের জগৎ থেকে সরোজ বাস্তব জগতে ফিরে এলো, দেখলো যে রক্ষী দু'জন বন্দীদের পাহারা দিচ্ছিল, তারা পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে—এই সুযোগ।

গাছের আড়াল হতে দু'জনে নিঃশব্দে যে ঢিবিটায় বন্দীরা বসেছিল, তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, সরোজ বিনয়বাবুর কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে বললো—চুপ! যদি বাঁচতে চাও তো তাড়াতাড়ি এসো—

বিনয়বাবু ও ডাক্তার উঠে দাঁড়ালো, মেয়েটির পানে ফিরে সরোজ বললো,—তুমিও এসো—

কিন্তু এসো বললেই কি আসা এত সহজ !

সহসা ডাক্তারের গান বন্ধ হতেই রক্ষীরা ফিরে দাঁড়ালো। কিন্তু প্রথম রক্ষী কিছু করার আগেই ডেভিডের প্রচণ্ড এক ঘুসি এসে পড়লো তার মুখের উপর, সে ঘুরে পড়ে গেল। দ্বিতীয় রক্ষী ব্যাপার সুবিধা নয় বুঝে ছুটে গিয়ে চীৎকার করে লোকজন ডাকতে স্রুরু করে দিল। দেখতে দেখতে আরো জন কয়েক জমু-রক্ষী পাহাড়ের উপর এসে পড়লো।

চারজন তখন সবেমাত্র সিঁড়ির উপর বুক দিয়ে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে, আর ডেভিড সবেমাত্র সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, চীৎকার করে সে বললো—তোমরা তাড়াতাড়ি এগোও আমি ততক্ষণ এদের ঠেকিয়ে রাখছি—

হাতের পিস্তল বাগিয়ে ধরে সে দাঁড়ালো।

প্রথমেই যে ক'জন জমু তাড়া করে এসেছিল তাদের একজন দেখতে দেখতে বুকে হাত চেপে ছিট্‌কে ঘুরে পড়লো, ডেভিড তাকে গুলি করেছিল।

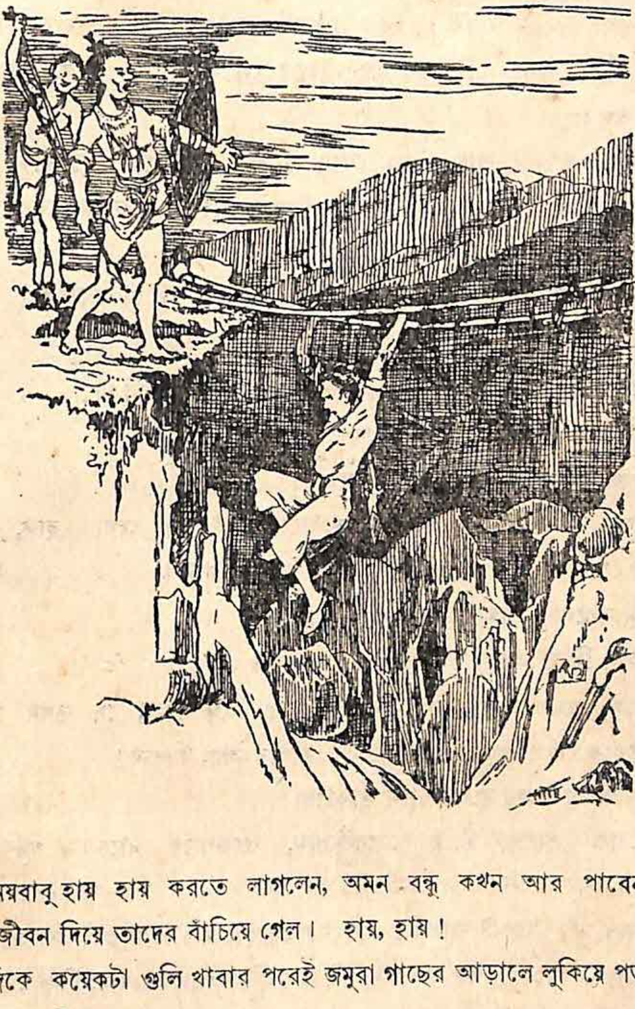
জমুর দল একবার শুধু থম্‌কে দাঁড়ালো তারপর যেমন করে জলের ঢেউ এগিয়ে আসে তেমনি করে এগিয়ে এল। ডেভিড চুপ করে রইল না, তার হাতের পিস্তলের ঘোড়া অবিরাম খট্ খট্ করে শব্দ করে চললো।

একটি একটি করে জমু গুলি খেয়ে শুয়ে পড়তে লাগলো তথাপি এগিয়ে আসতে তারা ছাড়লো না। ডেভিডের কাছে গুলিও বেশী ছিল না, দেখতে দেখতে তারা ডেভিডের অত্যন্ত কাছে এসে পড়লো। চারজন তখন এদিকে প্রায় এসে পৌছেচে।

ডেভিড তখনও আশা ছাড়ে নি। পিস্তলটি বেল্টে গুঁজে সে সিঁড়ির উপর লাফিয়ে পড়লো। কিন্তু বুকে হেঁটে লোকে আর কত তাড়াতাড়ি যেতে পারে ? একটি জমু ছুটে তাকে ধরতে গেল, শেষে ধরতে না পেরে বল্লমের খোঁচা মেরে ডেভিডকে মইয়ের উপর থেকে ঠেলে দিল। ঠিক সেই সময় ওপার থেকে সনির বন্দুক গর্জে উঠলো। ডেভিডকে যে ফেলে দিয়েছিল সেও গুলি খেয়ে খাদের মধ্যে ঘুরে পড়লো। কিন্তু ডেভিডকে রক্ষা করতে পারা গেল না, সে তার অনেক আগেই পড়ে গেছে।

সরোজ, ডাক্তার, বিনয়বাবু ও আবাং সর্দারের মেয়ে—চারজনেই এদিকে এসে পৌছলো। মই টেনে তুলে নেওয়া হোল। সনি গায়ের জ্বালা মিটাবার

জন্য অবিরাম বন্দুকের ঘোড়া টিপে চললো—একটি জমুকেও সে আজ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না।



বিনয়বাবু হায় হায় করতে লাগলেন, অমন বন্ধু কখন আর পাবেন না, নিজের জীবন দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে গেল। হায়, হায়!

ওদিকে কয়েকটা গুলি খাবার পরেই জমুরা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। সনির আর গুলি করা হোল না।

সরোজ বললো—আমার কোমরে একটি দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দাও দিকি, আমি নীচে গিয়ে দেখবো ডেভিডের কি হোল।

আবাং সর্দার হেসে বললো—পাগল নাকি! এই রাত্রির অন্ধকারে কোথায়

যাবেন ? ও খাদ কি দু' এক হাত নাকি ? শুনি এই খাদ নাকি পাতালে গেছে, আর এই অন্ধকারে আপনি কি দেখবেন ?

—মশাল নিয়ে নাব্‌বো—

—পাগল হলেন নাকি ? সেই মশালের আগুনে যদি আপনার কোমরের দড়িটাই পুড়ে যায় ? দিনের আলো হলে সে এক কথা ছিল, কিন্তু এই রাতের অন্ধকারে……

আবাং সর্দারের কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে সরোজকে নিরস্ত হতে হোল, আর সত্যই তো এই অন্ধকারে খাদের মধ্যে মশালের আলোয় কতদূরই বা দেখা যায়, টর্চেই বা কি হবে।

বন্ধু হারিয়ে শোকে দুঃখে গুম্ হয়ে সকলে ফেরার পথে পা বাড়ালো।

পরদিন সকাল থেকে সরোজের আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তার সঙ্গে চারজন কুলিও নিরুদ্দেশ।

খুঁজে খুঁজে সকলে হয়রান হয়ে গেল।

শেষে বিনয়বাবু বললেন—আজে-বাজে সবই তো দেখা হোল, আমার মনে হয় সে খাদের মধ্যে ডেভিডের খোঁজ করতে গেছে।

সনি বললো—আমারও তাই বিশ্বাস।

সকলে মিলে চললো তখন সেই খাদের ধারে।

সুড়ঙ্গ পথের মাঝামাঝি এসে সরোজের সঙ্গে দেখা, সে তখন ফিরছে, বিনয়বাবুকে দেখে বললো—ডেভিড যে কোথায় গেল, আশ্চর্য !

সকলে সরোজের মুখের পানে তাকালো।

সরোজ বললো—নীচে নেবেছিলাম, একেবারে নীচে। খুব গভীর তো নয়, খুব বেশী হলে পাঁচশো ফুট হবে। যত জল আর কাদা জমে আছে ওখানে। একটি জায়গায় মানুষের দেহের মত কাদার উপর একটি দাগ ও দেখলুম, পায়ের দাগ দেখলুম, কিন্তু ডেভিড গেল কোথায়, কিছু তো বুঝতে পারছি না।

—কোন জানোয়ারে টেনে নিয়ে যায়নি তো ?

—জানোয়ার পাচ্ছ কোথায় ? দু'পাশে খাড়া পাহাড়, ওখানে জানোয়ার যাবে কেমন করে, আর সে রকম কাদায় একবার নাব্‌লে উঠে আসা মুস্কিল।

সে-কাদায় পড়লে মানুষ মরে না। ডেভিড মরেনি, মরলেও তো তাকে ওখানে দেখতে পেতাম, কিন্তু সে গেল কোথা ?

—মানুষের পায়ের দাগ দেখলে তো—সেটা কোথায় গেছে দেখলে না ?

—ওধারে খাদের গায়ে গিয়ে লেগেছে, তারপর আর দাগ নেই।

—তাহলে ওধার থেকে জমুরা রাতারাতি খাদে নেবে তাকে তুলে নিয়ে যায় নি তো ?

—কিন্তু রাত্রে এ খাদের মধ্যে নামতে কি ওরা সাহস করবে ?

—তুমি বাংলা মুল্লুকের লোক হয়ে সাহস করেছ, আর ওরা এদেশের পাহাড়ী জাত হয়ে সে সাহস রাখবে না ?

—তা বটে। তবে এখন উপায় ?

—চল, আগে সর্দারের সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করিগে—

—কিন্তু সর্দার তার মেয়েকে পেয়ে কাল রাত থেকে মেয়ে নিয়েই তো ব্যস্ত।

—তা বলে তো আর ডেভিডের সন্ধান না নিয়ে আমরা এখান থেকে নড়ছি না। আর সর্দার মেয়েকে ফিরে পেলে কাদের জন্য, আমাদের জন্যই তো ? না হলে তো সে ভল্লুকের পেটে যেত, সে কথা তো ভুললে চলবে না।......

সরোজ আর কোন কথা বললো না, মুখ বুঁজে পথ চললো।

—এগারো—

ডেভিডের মাথা ঘুরে গেল।

সিঁড়ির উপর থেকে এমনভাবে তাকে ফেলে দেবে তা যদি আগে জানতো তা হলে জমুদের হাতে বন্দী হওয়াও তো ভাল ছিল।

এরোপ্লেন থেকে ডেভিড বহুবার লাফিয়েছে। তবে এমনভাবে কোনদিন পড়তে হয় নি। তখন ছিল প্যারাচুট, নীচে কোথায় নামতে হবে, তাও চোখে দেখা যায়। পড়বার আগে মনকেও তৈরী করে নেওয়া যায়। আর এ কি হোল, কোথায় কত নীচে পাথরের বুকে পড়ে থেঁৎলে যাবে—ওঃ !

পতনের বেগে ডেভিডের দম বন্ধ হয়ে এল, ভয়ে সে চোখ বুঁজে মনে মনে যিশুখৃষ্টের নাম স্মরণ করলো !

শুধু কয়েকটা মুহূর্ত……

ডেভিডের সারা দেহের মধ্যে—শিরায় শিরায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে, রক্তের তালে তালে, কি যেন একটা ঘটে গেল, সারা পৃথিবী বুঝি বারোটা সূর্যের তেজে পুড়ে গেল, একটি আগ্নেয়গিরি বুঝি চারিপাশ বিদীর্ণ করে ফেটে গেল, সর্বসংহারী ভুমিকম্পে জগৎ বুঝি চুরমার হ'য়ে গেল, খণ্ড প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসে পৃথিবী প্রলয় করে অনন্ত নাগের বুকে বসে নারায়ণ বুঝি অট্টহাসি হেসে উঠলেন… —চারশো চল্লিশ ভোল্টের ইলেকট্রিক যেন শক মরলো, মাথার মধ্যে যেন অসংখ্য আলো জ্বলে উঠলো, ডেভিড পড়লো—ডেভিড মরলো!

মৃত্যুর পরেও যে মানুষ বাঁচে তা কে জানত!

তবে কি সে মৃত্যুর ওপারে গিয়ে পৌছলো নাকি?

না; পরলোকে কি এমন সুন্দর খড়ের বিছানা পাওয়া যায়!……তবে সে মরে নি, অজ্ঞান হয়েছিল?……অমন পাহাড়ী খাদের মধ্যে পড়েও মরে নি—বেঁচে গেছে! আঃ!

ডেভিড পাশ ফিরে শুয়ে আরেক ঘুম ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলো।

সবে চোখ বুঁজেছে এমন সময় দু'জন লোক এসে তাকে ধরে উঠালো। লোক দু'টিকে দেখে ভয় হবারই কথা। কালো পাথর কেটে কে যেন দুটি মানুষ গড়েছে। ডেভিডকে তারা বাহিরে নিয়ে এলো, সূর্য তখন প্রায় ডুবতে বসেছে।

ডেভিড্‌কে তারা স্নান করালো, এক রকম গাছের ছাল পরতে দিল, তারপর অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে রাত্রির অন্ধকারে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো। সারা দিন আহার নেই, তার উপর স্নান করা, পাহাড়ী পথ চলা—শরীর আর বয় না।

কিন্তু ডেভিড না চলতে পারলে কি হবে তাকে যেতেই হবে।

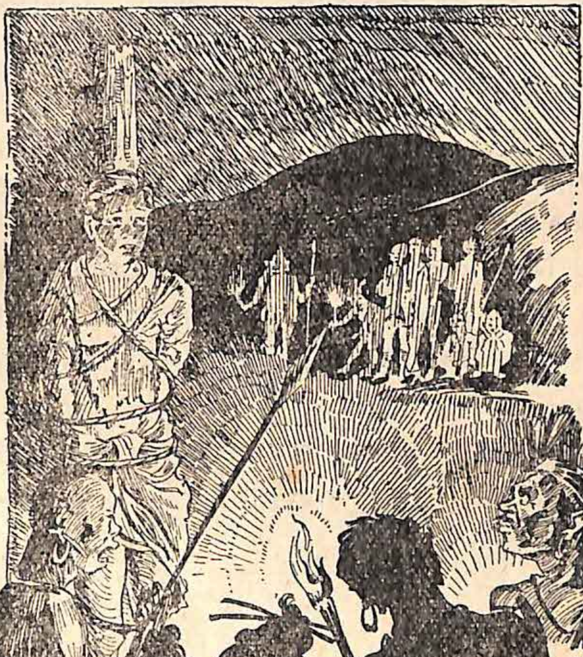
একটা গুহার মধ্যে তাকে নিয়ে আসা হোল।

ভিতরটা অন্ধকার, ধূপধুনার গন্ধে ও ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। প্রথমেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তারপর খানিকক্ষণ পরে চোখে সহে গেলে দেখতে পেল সেটা ঠিক গুহা নয়, একটি মন্দির বললেই হয়। একদিকে দুটি উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলছে, দেওয়ালের গায়ে পাথরের বুকে খোদাই করা প্রকাণ্ড এক মূর্তি—

দেবতার কি দানবের তা বোঝা যায় না। মাথার উপর একটি ঘণ্টা ঝুলছে, ডেভিডের এক সঙ্গী সেই ঘণ্টার দড়ি টেনে ঠং ঠং করে বাজালো। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—আগচ্ছ—!

ডেভিডকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হোল। যে কথা কইছিল এবার ডেভিড তাকে দেখতে পেল, জটায় মুখ ঢাকা, চোখ দুটির পানে তাকাতে ভয় করে। কালো মিশমিশে দাড়িগোঁপের ফাঁক থেকে লাল দুটি চোখ যেন জ্বলছে।

লোকটি কি কতকগুলি কথা বিড় বিড় করে বলতে বলতে ডেভিডের কপালে বড় বড় কয়েকটা সিঁদুরের ফোঁটা দিল, তারপর ডেভিডের মাথায় লতাপাতা-



জড়ানো একটি পাগ্‌ড়ি পরিয়ে দিয়ে, একটা জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে পাগ্‌ড়ির উপর বসিয়ে দিল। তারপর তারা ডেভিডকে নিয়ে সেখান থেকে বাহির হয়ে

পড়লো। ডেভিডের একবার মনে হোল প্রদীপটা মাথা নেড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখবার কৌতূহল ছিল তার অপরিসীম, তাই সে মুখ বুঁজে চললো।

সিঁড়ির পর সিঁড়ি চলেছে। কত সিঁড়ি তা কে বলবে? পায়ের শিরাগুলি যখন টেনে ধরার উপক্রম হয়েছে, এমন সময় একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লো। জায়গাটা দেখলে এম্ফিথিয়েটারের কথা মনে জাগে; নীচে সমতল জমি ঘিরে পাহাড় উঠেছে, সেই পাহাহের গায়ে এমন ভাবে একটা বেষ্টনী দেওয়া আছে, যেন বারান্দা। চাঁদের আলো থাকলে ডেভিড বুঝতে পারতো, তাকে দেখবার জন্য সেই বারান্দার উপর কত লোক জমা হয়েছে। জায়গাটার মাঝখানে বাঁশের খুঁটি ছিল তার সঙ্গে ডেভিডকে তারা বেঁধে ফেললো। ডেভিড কোন বাধা দিল না, দিলেও সে পারতো না।

ডেভিডকে বেঁধে দু'জনে চলে গেল।

পাহাড়ী বারান্দায় লোকের চীৎকার জাগলো, একে একে অবিরাম মশালের আলো জলে উঠলো। ডেভিড তাকিয়ে দেখলো চারিদিক থেকে লোক তাকে দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়েছে।

তারপর কি যে হোল সে ঠিক বুঝলো না, একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনে নীচে চোখ নামিয়ে দেখে দুটি কালো কালো প্রকাণ্ড ভল্লুক মাথা দুলাতে দুলাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তার পিছনে আসছে আরও দুটি। তার পিছনে আরো······

এই ভল্লুকের দল এখুনি তাকে ছিঁড়ে খাবে। কোন উপায় নেই। মৃত্যু—অসহ্য যাতনা সহে তাকে মরতে হবে—অনিবার্য!

ডেভিড চোখ বুঁজলো।

—বারো—

এদের দেখে আবাং সর্দার তো লাফিয়ে উঠলো, বললো—কোথায় ছিলেন আপনারা? এই মাত্র আমি লোক পাঠালুম আপনাদের খোঁজে—

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কেন কি হয়েছে?

আমাদের গুপ্তচর দু'জন ফিরে এসেছে। জরুরী খবর এনেছে, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন্ এখনই আমাদের বেরুতে হবে।

—কোথায় ?

—সে অনেক কথা, পথে যেতে যেতে বলবো। এখন শুধু জেনে রাখুন আপনাদের সেই বন্ধুটিকে জমুরা আজ রাত্রে ভল্লুকের মুখে ফেলে দেবে। তাকে উদ্ধার করার জন্য······

সরোজের মুখের বিমর্যভাব একেবারে কেটে গেল, সে বললো—আমি তৈরী !

—কিন্তু আপনাদের এখনও স্নান আহার হয়নি।

সরোজ বললো—ও কিছু না, I am quite O. K.

সনি বললো—I am also O. K.

বিনয়বাবু বললেন—আমরা এখনই যাবো সর্দার।

ডাক্তার বললো—কিন্তু, খানিকক্ষণ জিরিয়ে আহারাদি করে যাওয়াটাই কি ভাল নয় ?

সরোজ বললো—বেশ, তবে আপনি থাকুন, আমরা ঘুরে আসি।

ডাক্তার বললো না, আমি ভীরু নই। আপনাদের পাশে না হয়, পিছনে দাঁড়াবার সাহস আমার আছে। তবে কি জানেন ? ডাক্তার হিসাবে দেহের উপর দৃষ্টি রাখা আমার প্রধান কর্তব্য। তবে আপনারা যদি পারেন, আমিই বা পারবো না কেন ?

ডাক্তার যাক বা না-যাক তাতে কারও আসে যায় না। তিনজনে তখনি যাত্রা করবার উদ্যোগ করলো। অবশ্য ডাক্তার তাদের সঙ্গ ছাড়লো না।

আবার পাহাড়ী পথ।

সুড়ঙ্গ না হলেও পথটা সুড়ঙ্গের মতই সঙ্কীর্ণ। এ পথে কোনদিন মানুষ চলেছিল বলে তো মনে হয় না। কখনও লাফিয়ে, কখন শুয়ে পড়ে, কখন একটি দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে সকলে নেমে এলো, সেটি উপত্যকা কি খাদ, ঠিক করে বুঝবার উপায় নেই। সামনে দিয়ে ঝিরঝির করে ঝর্ণা বহে চলেছে, তা ছাড়া চারি-পাশেই ছোট বড় নানা গাছ গজিয়ে ঘন জঙ্গল করে ফেলেছে। যে গুপ্তচরটি পথ দেখাচ্ছিল, সে বললো—ওই ঝর্ণা বহে এবার খানিক উপরে উঠতে হবে।

ঝর্ণা বহে উপরে ওঠা যে কি কঠিন, তা ধারণাও করতে পারা যায় না। পাথরের গায়ে শ্যাওলা ধরেছে, এত পিচ্ছিল যে পা রাখা যায় না। তবে সঙ্কীর্ণ ঝর্ণা, স্রোতের টান কম—এই যা কথা।



খানিকক্ষণ উঠতেই সামনে একটি ছোট মাঠ দেখা গেল, গুপ্তচর বললো এটা হচ্ছে যকের জঙ্গল, ওই যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন, ওই হচ্ছে যকের মন্দির, ওই খুঁটির সঙ্গে……

গুপ্তচরের কথা বেধে গেল।

এরা সকলে চেয়ে দেখলো মাঠের মাঝে খুঁটির সঙ্গে ডেভিড বাঁধা, আর কয়েকটা ভল্লুক চারিদিক থেকে তাকে আক্রমণ করেছে, এখনি ছিঁড়ে খাবে হয়তো। গুলি করারও সময় নাই, সরোজ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, ভোজালিখানি কোমর থেকে টেনে নিয়ে ছুটে গেল।

একটা ভল্লুক তখন ডেভিডের উপর লাফিয়ে পড়েছে। সরোজ তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে প্রকাণ্ড ভোজালিখানি ভালুকের চোখে বসিয়ে দিল। ভল্লুকটি ডেভিডকে ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ালো এবং তার প্রকাণ্ড দেহটা নিয়ে সরোজকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলো। দু' হাতের নখ দিয়ে গায়ের কোটটা টেনে ছিঁড়ে ফেললো। আবাং সর্দার সেই সময় প্রকাণ্ড টাঙ্গিখানা নিয়ে ছুটে না গেলে কি হোত বলা যায় না।

বিনয়বাবুর বন্দুক গর্জে উঠলো।

গুপ্তচরটা ছুটে গিয়ে ডেভিডের হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিল। ডেভিড তখন অজ্ঞান। সে মাটির উপর পড়ে যাচ্ছিল, ডাক্তার তাকে কাঁধে করে তুলে আনলো। ভল্লুকের নখের আঘাতে ডেভিডের কাঁধ থেকে তখন রক্ত ঝরছে।

ভল্লুকের মুখ থেকে সর্দার কোন রকমে সরোজকে রক্ষা করলো, কিন্তু ভল্লুক কি একটা! সবক'টি ভল্লুক তখন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে তাদের দিকে ছুটে আসছে।

পাহাড়ের উপরে যারা মজা দেখছিল, তাদের মধ্যে তখন হৈ হৈ পড়ে গেছে।

বিনয়বাবু বললেন—আর এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না, সরোজ ডিনামাইট্!

সরোজ ডাকলো সনি।

—ইয়েস্!

—রেডি?

—রেডি!

সনি এতক্ষণ একটু তফাতে গিয়ে পাহাড়ের একটি ছোট গুহার মধ্যে একটি প্যাকিং বাক্স্ রেখে তার চারিপাশে ঠিক করে পাথরের টুকরো, গাছপালা দিয়ে চাপা দিচ্ছিল। বাক্সের সঙ্গে দুটি ইলেকট্রিকের তার লাগানো ছিল, সে দুটি হাতে নিয়ে সনি সরোজের হাতে দিল।

সামনে তখন ভল্লুকের দল।

মাথার উপর থেকে জমুরা বল্লম ও পাথর ছুঁড়ছে।

সকলে তাড়াতাড়ি ছুটলো জঙ্গলের দিকে।

জঙ্গলে গাছের ছায়ায় এসে বল্লমের হাত থেকে বাঁচা গেল বটে, কিন্তু ভল্লুকের মুখ থেকে অত সহজে তো আর নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তবু অবসর পেয়ে সরোজ হাতের পিস্তল মাটিতে ফেলে দিয়া ইলেকট্রিক তারের দুটি মুখ ব্যাটারীর দু'দিকে চেপে ধরলো।

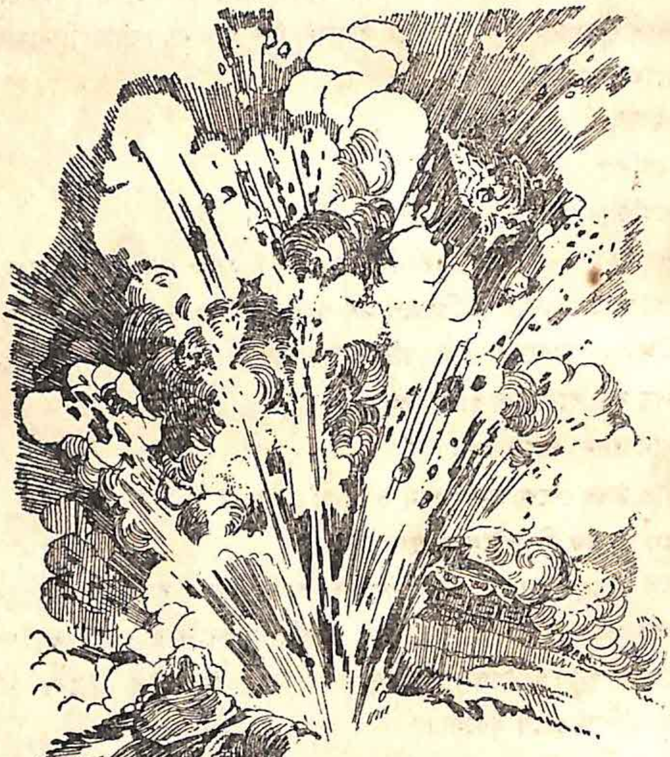
তিন সেকেণ্ডও পার হোল না। একটা ভীষণ শব্দে সারা পাহাড়টা কেঁপে উঠলো। সামনের পাহাড়টি আগুনের গোলার মত উপরে উঠে গিয়া তুবড়ীর মত ফেটে পড়লো। দু'একটা পাথরের কুচি ছিট্‌কে এসে লাগলো তাদের গায়ে।

আবাংরা নেচে উঠলো - জমুদের যকের মন্দির টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেছে, কত জমু মরেছে - যেমন পাপ তার তেমনি সাজা······

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর মানুষের কোলাহল ও আর্তনাদে চারিদিক মুখর হয়ে উঠলো, অজ্ঞান ডেভিডকে যখন কাঁধে নিয়ে চার বন্ধু ফিরছে।

—তেরো—

অসম্ভব খাটুনি গেছে, গায়ে হাতে পায়ে সব ব্যথা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে আর ইচ্ছে করে না। সকাল হয়ে গেছে, তথাপি চোখ বুঁজে সবাই বিছানায় পড়ে আছে।



সহসা দরজায় ঘা পড়লো,—খট্ খট্! খটাখট্।

—কে ?

—আমি সর্দার।

—সর্দার ? এতো সকালে ?—সরোজ উঠে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপার কি ?

—ব্যাপার ভয়ানক। ওদের যক্ষ দেবতার মূর্তি এসে পড়েছে আমাদের সহরের মাথায়। সেই মূর্তিকে উদ্ধার করার জন্য দলে দলে জমুরা আসছে আমাদের আক্রমণ করতে।

—সত্যি ?

—আর সত্যি মিথ্যার কি আছে মশাই, বাহিরে এলেই ত সব বুঝতে পারবেন।

সকলে বাহিরে এসে দাঁড়ালো। আবাং সর্দার দেখিয়ে দিল, সাম্‌নের পাহাড়ে প্রকাণ্ড যক্ষ দেবতার পাথরের মুণ্ডটি এসে পড়েছে। প্রকাণ্ড মুণ্ডটা হাঁ করে তাদের পানে তাকিয়ে আছে, সজীব হলে এখনি তাদের গিলে খেতো বুঝি, দেখলে ভয় হয়।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলো—জমুরা কৈ ?

—ওই যে দূরে বনের গাছপালা কাঁপছে দেখছেন—ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা আসছে—বলে সর্দার দূরে একটা জঙ্গল দেখিয়ে দিল। তার গাছপাতাগুলি সামান্য নড়ছে বটে, কিন্তু মানুষ দেখা যাচ্ছে না।

কতকক্ষণ সেদিকে সকলে চেয়ে রইল। শেষে বিনয়বাবু বললেন—অত ভয় পাচ্ছ কেন সর্দার, তোমার সৈন্য নেই।

—আছে, কিন্তু······

সহসা একটি লোক ছুটে এসে জানালো - সর্দার জমুরা এক ক্রোশের মধ্যে এসে পড়েছে—

—ঢাক পিটিয়ে সকলকে সাবধান করে দাও সৈন্যরা যেন তৈরী থাকে, আমি এঁদের নিয়ে যাচ্ছি।

লোকটি চলে গেল, একটু বাদেই দুম্ দুম্ করে দামামার শব্দ শোনা গেল। বন্ধু পাঁচজন তখন তৈরী।

জঙ্গলের মধ্যে ছোট একটি ঢিবি। ঢিবি হলে কি হয়, তার উপর থেকে অনেক নীচে পর্যন্ত বেশ দেখতে পাওয়া যায়, শত্রুদের উপর গুলি চালাবার এমন সুবিধা আর কোথাও নেই। ক'জন জমু জঙ্গলের বাহিরে আসতেই সরোজের গুলি

ছুটলো। লক্ষ্য তার কখনও ব্যর্থ হয় না। ক'জন তো সেইখানেই শুয়ে পড়লো, আর ক'জন আবার জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

তারপর আর একটি জমুরও দেখা নেই।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল।

সরোজ বললো—ব্যাটারা গুলি খেয়ে ভেগেছে!

সর্দার বললো—ভাগার লোক তারা নয়, দিনের আলোয় সুবিধা হবে না দেখে গা ঢাকা দিলে—রাত্রের অন্ধকারে আবার আসবে।

—কিন্তু রাত্রে এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লোক এলে কি করে জানবো? আলোর কোন ব্যবস্থা করা যায় না?

—আলো···মশালের আলো···

—আমাদের টর্চ আছে তো?

—সনি যাও, ব্যাটারী যা আছে সব ঠিক করে টর্চ দুটো নিয়ে এস দেখি—

সনি টর্চ আনতে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে জানালো—টর্চ জ্বলবে না, ঠাণ্ডায় সব ব্যাটারী নষ্ট হয়ে গেছে!

—এখন কি করা যায়।

করার কিছুই ছিল না। যা হোক্ ফলমূল কিছু খেয়ে সকলে সেইখানে বসলো পরামর্শ করতে।

ডেভিড বললো—এবার ওরা আমায় ধরতে পারলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে।

সরোজ বললো – ধরতে পারলে তবে তো।

—রাত্রে কি করবে শুনি?

কি করবে সরোজ নিজেই জানতো না।

শেষে ঠিক হোল, কিছু না পারা যায়, চারিদিকের জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে তার মাঝে চুপ করে বসে থাকা যাবে, কোন জমু সেই অগ্নিব্যূহ ভেদ করতে পারবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আগুন লাগাতে হোল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে না উঠতেই ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট আগুন-বাঁধা তীর এসে পড়তে লাগলো চারিপাশের গাছপালার উপর। দেখতে দেখতে চারিপাশের জঙ্গল আগুনে লাল হয়ে উঠলো।

সরোজ দু' একটী গুলি ছুঁড়লো, তাতে জমুরা ভয় পেল কিনা কে জানে।

ওদিকে আবাংদের সারা গ্রামের বুকে হৈ হৈ পড়ে গেল, মারামারি সুরু হয়ে

গেছে! জমুরা এতক্ষণে তাহলে আক্রমণ করেছে, অন্ধকারে তাকিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না—শুধু শোনা যাচ্ছে চীৎকার হৈহৈ রৈরৈ আর হল্লা। আবাংদের কাছে গিয়ে যে সাহায্য করবে তার উপায় নাই। চারিপাশে আগুন জ্বলছে, বাহির হবার পথ নাই। সিংহ যেন শিকারীর জালে বাঁধা পড়েছে।

রাত্রি শেষ হবার অনেক আগেই চীৎকার থেমে গেল।

আগুন জ্বলতে জ্বলতে অনেকটা পিছিয়ে গেছে।

সর্দার এতক্ষণ ছট্‌ফট করছিল এবার বললো—চলুন, বাহিরে গিয়ে দেখে আসি আমাদের লোকজনেরা কি করলো।

রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে।

কি করে যে পোড়া গাছের গুঁড়ি আর জ্বলন্ত জঙ্গল পাশ কাটিয়ে বাহিরে এলো তা তারাই জানে।

সনি বললো—উঃ, কি তেষ্টাই না পেয়েছে! এবার একটু জল খেয়ে বাঁচবো—

কিন্তু জল খেতে আর হোল না। বাইরে আসতে না আসতেই চারিপাশে যে জমুর দল দাঁড়ায়েছিল, তারা একেবারে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লো। পিস্তলের গুলি চালাবার অবসর মিললো না, লোহার ভাঁটা খেয়ে একে একে সকলে শুয়ে পড়লো। ভাল করে রুখে দাঁড়াবার মত সময়ও পাওয়া গেল না।

একটা ঝড় বহে গেল যেন।

—চৌদ্দ—

বিচার সভা।

মাঠে একটা বেতের মোড়ার উপর জমুসর্দার বসেছে, তার চারিপাশে জমু সৈন্য। মাঝে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্দী আবাং সৈন্যের দল। সকলের পিছনে পিছ্‌মোড়া করে হাত বাঁধা—সরোজ ও সনি, ডেভিড ও ডাক্তার, বিনয়বাবু ও আবাং সর্দার।

বিচারের সময় যে সব আবাং শপথ করে জমুদের দাসত্ব করতে রাজী হোল তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। আর যারা রাজী হোল না তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে

মারবার আদেশ হোল—তবে সংখ্যায় তারা অত্যন্ত কমা। সব শেষে এরা ছ'জন।

জমু সর্দার বললো—তোমরা আমাদের, মানে জমুজাতির সব চেয়ে বড় শত্রু। তোমাদের কৌশলে আমরা আমাদের যক্ষ-দেবতাকে হারিয়েছি; তবে তোমাদের সাহস ও বুদ্ধির আমি প্রশংসা করি। কত বাঙ্গালীকে আমরা যক্ষ-দেবতার কাছে বলি দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের মত বাঙালী আমি দেখিনি। তোমরা যদি আমার পূর্বের কথামত আমার ছেলের দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও, তাহলে তোমাদের আমি ছেড়ে দিতে পারি—

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললো—পারবো না, একজনের অনিচ্ছা সত্বেও তার দুটো চোখ উপড়ে নিয়ে আপনার ছেলের চোখ দিতে আমি পারবো না।

—তাহলে ওদের মত তোমাদেরকেও আগুনে পোড়ানো হবে, ভেবে দেখ।

—ভেবে দেখেছি সর্দার। অন্যায়কে স্বীকার করতে আমরা শিখিনি, আমাদের দেশে কি বলে জানো সর্দার ?—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে।
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।'

সর্দার গম্ভীর হয়ে বললো—কথাটি ঠিক-ই। তোমাদের দহনের ব্যবস্থাই তাহলে করি। তারপর অনুচরদের পানে ফিরে বললো—খুঁটি ঠিক কর, এদের সব জীবন্ত পোড়ানো হবে, আমি নিজের চোখে দেখবো—

জমুসর্দারের তখনকার মুখের পানে তাকালে বুকের ভিতর পর্যন্ত কেঁপে উঠে।

দেখতে দেখতে কয়েকটি বড় বড় খুঁটি এসে পড়লো। মাটি খুঁড়ে খুঁটিগুলির গোড়ার দিকটা পুঁতে সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। তারপর একটি খুঁটির নীচে শুকনো ডালপালা, খড় পাতা জড়ো করা হোল। শেষে এক একটি লোককে এক একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হোল। এইবার শুধু খড়ে আগুন দিলেই হয়!

কয়েকজন আবাং প্রাণের মায়ায় চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, কাতর স্বরে বললো—আমাদের পুড়িয়ে মেরো না সর্দার, আমরা তোমার কুকুর হয়ে থাকবো।

জমু সর্দার কোন কথা বললো না, শুধু একটু হেসে হাতের ইসারা করলো মাত্র! ইসারা পেয়েই মশাল হাতে নিয়ে একটি লোক এগিয়ে এলো।

ডেভিড বললো—ডাক্তার, একটা মুখের কথা তো শুধু, বলই না যে ছেলেটার

চোখ ঠিক করে দোব। তাহলে এই জীবন্ত পুড়ে মরার হাত থেকে বাঁচা যায়!

ডাক্তার মাথা নাড়লো, বললো—না, আমি তা পারবো না। গান্ধীর দেশের লোক আমি, জন্মেছি বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের দেশে—সত্যের জন্য জীবন দোব তবু মিছে কথা বলতে পারবো না!

এর উপর আর কথা নেই।

জমু সর্দার জিজ্ঞাসা করলো—আমার কথায় এখনও তোমরা রাজী কিনা?

—না!

—এই শেষ কথা?

—হ্যাঁ। এই শেষ কথা।

—বেশ।—বলে সর্দার অনুচরদের পানে ফিরে বললো,—আগুন লাগাও—

সহসা আবাংসর্দার চীৎকার করে উঠলো—আমার মেয়ের কি হোল সর্দার?

হি-হি করে সর্দার হেসে বললো—তোমার মেয়ে? মরবার আগে মেয়ের কথা ভুলে গিয়ে ভগবানের নাম কর এবার!

—না সর্দার, মেয়ের খবরটা একবার বল সর্দার—শান্তিতে তাহলে মরতে পারবো—

—বেশ তবে শোন, তোমার পাপে আমাদের দেবতাকে আমরা হারিয়েছি, তাই তোমার মেয়ের রক্তে বেদী ধুয়ে দেবতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে,—বুঝলে?

—না না সর্দার, তাকে মের না, সে ছেলেমানুষ, সে তো কোন দোষ করেনি! —আবাংসর্দার কেঁদে উঠলো। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জমু সর্দার অনুচরকে আবার আদেশ দিলেন—চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? আগুন লাগা!

দেখতে দেখতে শুকনো খড় ডাল পাতা ধূ ধূ করে জ্বলে উঠলো, সরোজ বললো এইবার সকলে ভগবানের নাম করে নাও, এ জীবনের তো এইখানেই শেষ হোল—

পায়ে আগুনের আঁচ এসে লাগলো। মাঝে মাঝে দু' একটা স্ফুলিঙ্গ গায়ে পড়ে ছুঁচের মত বিঁধতে লাগলো। জ্বলে পুড়ে মরবার আগে সব ক'টি বন্ধু চোখ বুঁজে ভগবানের নাম করতে লাগলো। এবার মৃত্যুর সাম্নাসাম্নি এসে পড়েছে আর পাশ কাটাবার কোন উপায় নাই।

যতই হোক বাঙ্গালী তো? শেষ মুহূর্তে ডাক্তার চীৎকার করে উঠলো—এমনভাবে মরতে পারবো না সর্দার, তোমার ছেলের চোখ ফিরিয়ে দোব···

সর্দারের মুখে হাসি ফুটলো, অনুচরদের কি বলতেই তারা ছুটে এসে বড় বড় লাঠির খোঁচা মেরে আগুন সরিয়ে পাঁচজনকে মুক্তি দিল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো—আবাং সর্দার?

—ওকে অমনি ভাবে মরতে হবে, ওর জন্যেই আমাদের এতো ক্ষতি।

—না, না, ওকেও বাঁচান!

—আপনি কি ভাবেন, আমি আপনার কথা মত চলবো?

ডাক্তার আর কি বলবে ভেবে পেল না। আগুন তখন আবাংসর্দারের প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ঠেলে আসছে। আগুনের তাপে আবাংসর্দার কুঁকড়ে উঠছে, সে দৃশ্য দেখতে পারা যায় না। সরোজ ক্ষেপে গেল। হাতের বাঁধনটা খোলা পেয়েই সামনের এক অনুচরের হাত থেকে একগাছি লাঠি কেড়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে আবাংসর্দারের পায়ের নীচে থেকে জলন্ত কাঠ-কুটোগুলো সরিয়ে ফেললো।

জমু সর্দার চীৎকার করে উঠলো,—বাঁধো, ওই বাঙ্গালীটাকেও বাঁধো, আবাং সর্দারের সঙ্গে—ছু'জনে এক সঙ্গেই নরকে যাক্।

জমুগুলো হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো।

সনি চুপ করে থাকতে পারলো, সেও এক অনুচরের হাত থেকে একখানি লাঠি কেড়ে নিয়ে ছুটে গেল সরোজকে সাহায্য করতে। সরোজের সাহায্যের কিন্তু দরকার ছিল না। লাঠি হাতে সে একাই একশো।

জমুরাও কম যায় না। সংখ্যায় তারা অনেক বেশী। সনি লাঠি ভাল করে চালাবার আগেই দশ জন তাকে ঘিরে ফেলে এমনভাবে থামিয়ে দিল যে হাতের লাঠি হাতেই রহিল, চালাতে আর হোল না। তবে সরোজের হাত পাকা কিন্তু সেই বা কি করবে, অবিরাম বাধা পেয়েও ছ'জনকে সে জখম করলো, তার হাতের লাঠিও তারা ছিনিয়ে নিল।

জমু সর্দারের হুকুম মত আবার সনি ও সরোজকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হোল, জলন্ত খড়গুলি টেনে আনা হল পায়ের নীচে। ডেভিড ও বিনয়বাবু সেদিকে তাকাতে পারলেন না, জনকয়েক জমু তাদের পাহারা দিচ্ছিল। আগুনের তাপে সরোজ ও সনি কুঁকড়ে উঠলো। নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নেবার আগে

সরোজের মুখে হাসি ফুটলো, ডেভিড ও বিনয়বাবুকে লক্ষ্য করে সে বললো—আবার দেখা হবে, দুঃখ কিসের ?

সরোজ গীতার শ্লোক আবৃত্তি করে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু যাতনায় মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। আগুনের তাপে ভাল করে সে আর কথা বলতে পারছিল না। তার দেহ তখন জলে যাচ্ছে।

সহসা গুড়গুড় করে শব্দ হল। পায়ের নীচে সমস্ত পাহাড় কেঁপে উঠলো। বাসুকির ফণায় দোলা লাগলো বুঝি !



একটা খণ্ড প্রলয় ঘটে গেল বুঝি। গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ করে পাহাড় ফেটে গেল, ধ্বসে পড়লো, মানুষের কাতর আর্তনাদে চারিদিক মুখর হয়ে উঠলো। যারা বিচার করছিল, যারা পুড়ে মরছিল—সব একাকার হয়ে গেল। পাহাড়ের প্রকাণ্ড এক একটি খণ্ড গাছ-পালা আর মানুষগুলিকে নিয়ে কোথায় যে ধ্বসে

পড়লো কে তার হিসাব রাখে ?···কি যেন একটা হয়ে গেল। ভাল করে বুঝবার, ভাল করে উপলব্ধি করবার আগে, সনি, ডেভিড, ডাক্তার, আবাংরা, জমুরা—সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, পায়ের নীচের পাথর সরে গেল, কোথায় কে তলিয়ে গেল।



কি হোল, কে কোথায় গেল, —তাহা ভাল করে বুঝবার আগেই পাথরের গায়ে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে সংজ্ঞাহীন মানুষগুলি পাহাড়ের ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! ভূমিকম্পের দোলা তখনও থামেনি।

—পনেরো—

উনিশ-শো-চৌত্রিশ সালের পনেরোই জানুয়ারী সারা ভারতের বুকে ভূমিকম্পের যে সংহার মূর্তি দেখা দিয়েছিল, সেই দুঃসংবাদের ফাঁকে খবরের কাগজে আমাদের জানবার মত যে ক'লাইন ছাপা হয়েছিল, তাই এখানে তুলে দিলাম ঃ

মজঃফরপুর ও মুঙ্গেরে ভূমিকম্পের শোচনীয় মৃত্যুলীলার খবর পাইয়া দমদম এরোড্রোম হইতে জনকয়েক বাঙালী পাইলট ব্যাপারটী প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের বর্ণনা পূর্বাপেক্ষা লোমহর্ষক এবং আরও মর্মান্তিক। তাহারা বলিয়াছেন, শুধু রেলপথ ধ্বসিয়া গিয়া, বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, প্রকাণ্ড সহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় নাই, সেই সব ধ্বংসস্তূপের নীচ হইতে মুমূর্ষুদের আর্তনাদ শোনা যাইতেছে। আর যাহারা আহত হয় নাই তাহারা পাগলের মত সহরের পথে পথে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে ··এখনই শত শত সাহায্যকারী গিয়া না পড়িলে, বড়-বড় সহরগুলির অবস্থা কি হইবে তাহা ভাবিতেও ভয় হয়।

ফিরিবার পথে বৈমানিকেরা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আসামের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসেন। ভূমিকম্পের বেগ আসামেও বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছে, তাহা গৌহাটীর খবরে প্রকাশ পাইয়াছে। তার উপর এঁরা বলেন অনেক পাহাড় ফাটিয়া গিয়া বড় বড় খাদ হইয়া গিয়াছে। দু'এক স্থানে পাহাড় সামান্য ধ্বসিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাহাড়ের উপর দু' একখানি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ তাহাদের নজরে পড়িয়াছে। বৈমানিকেরা কয়েকখানি ছবিও তুলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ফিরিবার সময় ব্রহ্মপুত্রের বুকে অনেকগুলি মনুষ্য দেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া গৌহাটীর জল-পুলিশ বিভাগে তাহারা খবর দিয়া যান। পুলিশ সেই ভাসমান লোকগুলিকে উদ্ধার করিয়াছে। সেই দলে কয়েকজন বাঙালী আছে বলিয়া প্রকাশ। তাহারা কিছু দিন পূর্বে আসামের জঙ্গলে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন ভূমিকম্পের ফলেই নাকি পাহাড় ধ্বসিয়া গিয়া তাহারা জলে পড়েন, সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা মরেন নাই। তবে সকলেই গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন, অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, বাঙালী ক'জন ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতার খ্যাতনামা চোখের ডাক্তার শ্রীঅজয় সেন যিনি কিছুদিন পূর্বেও

উমানন্দ ভৈরব দেখিয়া নৌকা করিয়া ফিরিবার পথে ব্রহ্মপুত্রের বুকে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন তাঁহাকেও এই দলে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আমাদের প্রতিনিধির কাছে আসামী জংলীদের সম্পর্কে তিনি এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, দুর্দান্ত জংলীরা তাঁহাকে ও তাঁহার বন্ধুগণকে পুড়াইয়া মারিবার আয়োজন করিয়াছিল, শুধু এই প্রবল ভূকম্পনের জন্যই তাঁহারা বাঁচিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বারান্তরে আমরা প্রকাশ করিব।

দিন কয়েক পরে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত অজয় সেনের যে কাহিনী ছাপা হয়েছিল—আমরা তা জানি। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাই পড়লাম, আবার নূতন করে বলতে গেলে তার পুনরাবৃত্তি হবে। সেই ভয়ে এইখানেই এই কাহিনীর যবনিকা টেনে দিলাম।

—শেষ—



—এক—

সহসা আর্তনাদ তুলে মোটরটা থেমে গেল।

গাড়ীতে আরোহী ছিল একজন। ভিতরে বসে কল্‌কব্জা কয়েকবার নাড়াচাড়া করেও গাড়ী যখন আর আধ-ইঞ্চিও অগ্রসর হোল না, তখন সে বাহিরে এসে দাঁড়ালো। হাতের টর্চ লাইটের আলোয় ভিতরের মেশিনটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে গাড়ীটা চালাবার চেষ্টা করলো, মোটর কিন্তু চললো না।

—ইস্‌, নতুন গাড়ী নিয়েও পথের মাঝে এমন বিপদে পড়তে হবে কে জানে, এই রাত্রে এখানে এখন করি কি ?—আপন মনে কথা কয়টি বলে চারিপাশে সে একবার তাকিয়ে নিল। পিছনে অন্ধকার গাছের ফাঁক দিয়ে পথটা এগিয়ে এসে সামনের রহস্যময় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে। একটা কেরোসিন তেলের আলো পথের ওপাশে মুমূর্ষু রোগীর মত ঝিমুচ্ছে। পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে গঙ্গার কালো জল। আর এক পাশে ছোট ছোট উঁচু-নীচু আল্‌ ঘেঁষে ধান ক্ষেত। মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু চারিপাশ ঘিরে অন্ধকার জমাট বাঁধছে।

হাতঘড়ির উপর টর্চের আলো ফেলে সে দেখলো রাত সওয়া এগারোটা বেজে গেছে। নিজেকে সে একটু বিপন্ন মনে করলো। নিমন্ত্রণ খেতে এসে এমন বিপদে পড়তে হবে কে জানতো। কাছাকাছি কোথাও যে এতরাত্রে মানুষের সাহায্য পাওয়া যাবে এমনও তো মনে হয় না, কি করবে খানিকক্ষণ ভেবেও সে স্থির করতে পারলো না।

সহসা অদূরে একটা আলো তার নজরে পড়ল। তবে কি কাছাকাছি কোন লোকের বসতি আছে নাকি, ভেবে সেই দিকে সে অগ্রসর হোল।

বেশীদূর নয়। মিনিট চার-পাঁচ যেতেই আলোটার খুব কাছে এসে পড়েছে বলে তার মনে হল। একটা গাছের ফাঁক মাত্র ব্যবধান, উঁকি মারতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো, তাতে তার মাথা পর্যন্ত চন্‌চন্‌ করে উঠলো।

সে দেখলো, গঙ্গার তীরে দুটি লোক একটা লোককে কাঁধে ফেলে অগ্রসর হচ্ছে। খানিকদূর গিয়ে একটা স্থান বেছে নিয়ে লোকটিকে সেখানে তারা নামিয়ে রাখলো। তারপর দু'জনে যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেইদিকেই ফিরে গেল।

তবে কি এরা কাউকে খুন করে রাত্রির অন্ধকারে মৃতদেহটি ফেলে রেখে সরে পড়ছে? সে এদের অনুসরণ করবে নাকি? ঘটনাটা কতদূর কি হয় দেখাই যাক্ না? ভেবে সরোজ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। আহাঃ, আজ যদি পিস্তলটা সে সঙ্গে নিয়ে আসত!

একস্থানে এসে দু'জনের একজন দাঁড়ালো এবং অপরকে আদেশ করলো—কারণ নিয়ে এসো আর ত্রিশূল, পরে আর সব জিনিষ আনলেও চলবে—

দ্বিতীয় লোকটি নীচে নেমে সরোজের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, একটু পরে উঠে এল একটি হাঁড়ি আর একটি ত্রিশূল নিয়ে। প্রথম লোকটি সেগুলি হাতে নিয়ে পূর্বস্থানে ফিরে এল। ততক্ষণে আকাশে ক্ষীণ একফালি চাঁদ উঠেছে। যা এতক্ষণ সরোজের চোখে স্তিমিত ছায়ার মত মনে হচ্ছিল, এবার তা স্পষ্টতর হয়ে দৃষ্টির সামনে ধরা দিল।

প্রথম লোকটি এবার শবটির উপর কয়েকবার কি একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে কারণ ছিটিয়ে দিল, তারপর চারিপাশে ত্রিশূলের একটা গণ্ডী টেনে দিয়ে চীৎকার করে উঠলো—জয় মা কালী, করালী, লোল-জিহ্বা, বিকট-দশনা মা!

গঙ্গার তীরে সেই স্তব্ধ রাত্রির বুকে, সেই চীৎকার এমন বিকট, এতো ভয়ঙ্কর হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সরোজের কানে এসে বাজলো যে, সরোজের সারা দেহ যেন কেঁপে উঠলো, দুঃসাহসী সরোজেরও বুকের মধ্যে ছম্‌ছম্ করে উঠলো।

দ্বিতীয় লোকটি একটা ঝুড়ি করে ততক্ষণে আরো কতকগুলি কি জিনিষ নিয়ে এসেছে। সেগুলি পাশে নামিয়ে রাখবার নির্দেশ দিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে প্রথম লোকটা আদেশ দিল—যাও, নৌকায় গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করগে—

লোকটি চলে গেল।

প্রথম লোকটি এবার কারণের হাঁড়িটা মুখের উপর তুলে ধরে ঢক্‌ঢক্ করে খানিকটা কারণ গলায় ঢাললো। তারপর মৃতদেহটাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে মৃতদেহটার বুকের উপর এসে বসলো, আরেকবার চীৎকার করে উঠলো—জয় মা কালী, করালী, করাল-বদনা বিকট-দশনা মা!

তারপরেই একবার মাতালের মত তীব্র কণ্ঠে হেসে উঠলো—হা, হা, হাঃ—

সেই বিকট চীৎকার, সেই অট্টহাসি ক্ষণেকের জন্য সরোজের চারিপাশের জগৎকে যেন বিভীষিকাময় করে তুললো, কেমন-যেন ভয়ে তার স্নায়ুগুলির বোধশক্তি লোপ পেল। তার মনের স্বাভাবিক অবস্থা কেমন-যেন জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার মত হোল। সরোজের মনে হোল, ওই শবটী বুঝি তারই মৃতদেহ, তারই



মৃতদেহের বুকে বসে ওই ভীষণদর্শন কাপালিকটী শব-সাধনার আয়োজন করছে, আর নিজের সাধনার আনন্দে উল্লাসিত হয়ে মাঝে মাঝে পিশাচের মত অট্টহাসি হেসে জয়োল্লাসে চীৎকার করে উঠছে—বিকট-দশনা, করাল-বদনা কালী— !

সহসা কোথা হতে একটা আর্ত চীৎকার সেই রাত্রির অন্ধকারকে আহত করে তুললো। কোথায় একটি লোক অসহনীয় যন্ত্রণায় একটু সাহায্যের ভরসা করেই বুঝি অমন করে পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো।

একবার···দুবার···তিনবার···

তৃতীয়বারের সে চীৎকার যেন অপরিসীম যন্ত্রণার, ক্ষীণ অথচ তীব্রতম, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের আর্তনাদ!

সরোজের সারা দেহ শিউরে উঠলো। এত নির্জন নদীতীরে রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কেউ কাউকে হত্যা করছে নাকি? সরোজ চারিপাশে দেখে নিল, সামনে পিছনে যতদূর দৃষ্টি চলে, ওই মৃতদেহের উপর উপবিষ্ট তান্ত্রিকটী ছাড়া আর তো কাউকে চোখে পড়ে না। তবে কি ওই মৃতদেহটীর মধ্যে পিশাচের অধিষ্ঠান হবার পরে ওই মৃতদেহটীই অমন করে চীৎকার করে উঠলো!

সরোজের গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো, মনে হোল অন্ধকারে তারই চারিপাশে অসংখ্য অশরীরী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে সরোজের ইচ্ছা করলো না, সে ধীরে ধীরে নিজের মোটরের কাছে চলে এল।

মোটরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় কে সহসা তার কাঁধে হাত রাখলো, চমকে খানিকটা সরে গিয়ে সরোজ পিছনে ফিরলো ফিরেই স্তব্ধ নিশ্চল কাঠের পুতুলের মত তার সর্ব দেহ স্থির, কঠিন হয়ে গেল। সরোজ দেখলো একটি লোকের দু'টি জ্বলন্ত চোখ তার মুখের পানে চেয়ে আছে। সে জ্বলন্ত দৃষ্টির আকর্ষণ থেকে সরোজ চোখ ফেরাতে পারলো না, অনড় অচল হয়ে গেল। আদেশ হোল—এসো—!

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কাঠের পুতুলের মত আদেশকারীর অনুসরণ করে রাত্রির অন্ধকারের বুকে বনানীর ফাঁকে সরোজ অদৃশ্য হয়ে গেল।

দু'দিন পরে খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে খবর ছাপা হোল:

মোটর আরোহীর আকস্মিক অন্তর্ধান

দুঃসাহসী নাগরিক নিরুদ্দেশ

কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরে 'সাহিত্য সেবক সমিতির' এক মজলিশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সরোজবাবু রাত সাড়ে দশটার সময় মোটরে করিয়া ফিরিতেছিলেন। মোটরে তিনি একা ছিলেন। নিজেই মোটর চালাইয়া

ফিরিতেছিলেন। ফিরিবার পথে কি ব্যাপার ঘটে জানা যায় নাই। রাত্রে তিনি আর বাড়ী ফিরিয়া আসেন নাই।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, পরদিন সকালে কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরে নন্দীগড়ের পথে গঙ্গার তীরে মোটরখানি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়, মোটরের মধ্যে কোনও আরোহী ছিল না। স্থানীয় লোকের কেমন যেন সন্দেহ হয়, তাহারা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ আসিয়া সন্ধান লইয়া জানিতে পারে যে, ওই মোটরেই সরোজবাবু বাড়ী ফিরিতেছিলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পুলিশ সরোজবাবুর কোন সন্ধান পায় নাই।

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে গত একমাসের মধ্যে এই অঞ্চলের এগারো জন লোক এমনিভাবে অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, অধিক রাত্রে জটাজূট-ধারী এক সাধুকে গঙ্গার তটে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাঁহারা দেখিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা যে এই সাধু কাপালিক ছাড়া আর কেউ নন। এতোগুলি লোকের অন্তর্ধানের মধ্যে এই সাধুরই কোন চক্রান্ত আছে। নন্দীগ্রামের বাসিন্দাদের মনে এই লইয়া এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, এতো বড় ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পরেও পুলিশ এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেছে না। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার যে বিরাট পুলিশ বাহিনী পুষিতেছেন, গুপ্ত রহস্য ভেদ করার জন্য যে গোয়েন্দা বিভাগ রহিয়াছে,—ইহাদের কি কর্তব্য ছিল না যে নন্দীগড়ের অধিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য, এগারো জন নিরুদ্দিষ্ট হইবার অনেক আগেই এই রহস্য সমাধান করিয়া ফেলা। পুলিশ এখনও কি করিতেছে তাহাই আমরা কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

—দুই—

উপরের খবরটী খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল দু'দিন পরে। এই দু'দিন সরোজের সন্ধান পাবার জন্য বিনয়বাবু ও ডেভিডের ছুটাছুটি করেই কেটে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ডেভিড ফিরতেই বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হোল ?

—দেখা করে সব কথাই তো বললুম। কিন্তু কমিশনার সাহেব তো আমার কথায় বিশেষ কোনই উৎসাহ দেখালেন না। তিনি বললেন, যে ক'জন ছেলে নিরুদ্দিষ্ট

হয়েছে, ওরা এনার্কিষ্ট (anarchist) দলে ছিল। রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকাতি করে বেড়াতো। শেষে আর স্থবিধা করতে না পেরে ধরা পড়ার ভয়ে আত্মগোপন করেছে, একদিন-না-একদিন তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়বেই। এই সম্বন্ধে তিনি যুক্তি দেখালেন যে, আজ পর্যন্ত যে ক'জন লোক নিরুদ্দেশ হয়েছে তারা সকলেই যুবক। কাপালিকদের দ্বারা এই ধরণের মানুষ চুরি হলে যুবকদের চেয়ে বালকদের ধরে নিয়ে যাওয়াই বেশী সহজ হত, এবং কাপালিকেরা সাধারণতঃ তাই করে থাকে ইত্যাদি···

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—সরোজের কথা কি বললেন ? - সে'ও কি তাহলে ওই এনার্কিষ্ট দলেরই একজন নাকি ?

—না, তা নয়। বললেন—একা পেয়ে নিজেদের দলবৃদ্ধি করার জন্য নাহলে গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে গেছে। গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করলে হয়তো খুন করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, কি মাটীতে পুঁতে ফেলেছে—কিছুই বলা যায় না। এনার্কিষ্টরা সব কিছুই করতে পারে। বড় সাহেবের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় আমরা আর কোন দিনই সরোজকে খুঁজে পাব না।

—ওতো হোল বড় সাহেবের যুক্তি ও কল্পনার কথা। ও সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না পেলে, সরোজ যে মারা গেছে সেকথা আমি বিশ্বাস করতে পারবো না।

—সরোজ মারা গেছে, একথা আমি ভাবতেও পারি না।

বিনয়বাবু হাসলেন, বললেন—ও-সব সেন্টিমেন্টের কথা এখন থাক্, সরোজের সন্ধান নেবার কতটুকু কি তুমি করতে পেরেছ তাই বল ?

—ব্যাপারটা বড় সাহেব সি-আই-ডি ডিপার্টমেণ্টের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন।

—কিন্তু ওদের ওপর আমার আস্থা কম, অত্যন্ত ঢিলে দিয়ে ওরা কাজ করে। এদিকে আমার বিশ্বাস সরোজকে যারা ধরে নিয়ে গেছে, তাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে হলে আর দেরী না করাই বুদ্ধিমানের কাজ !

—সে কথাও আমি বড় সাহেবকে বলেছি। তিনি হেসে জবাব দিলেন—'ইচ্ছা করলে তোমরাও সন্ধান করতে পার। আমার তাতে আপত্তি নেই।' সি-আই-ডির মুখ চেয়ে বসে না থেকে আমি মতলব করেছি আজই একবার সরোজের সন্ধানে বেরুবো ; আপনি কি বলেন ?

—আমারও তাই ইচ্ছা।

—বেশ, তাহলে আর কথার কি আছে? আজ রাত্রেই আমি নন্দীগড়ের ওদিকটায় একবার যাবো মনে করেছি।

রাত তখন প্রায় দশটা বাজে।

ডেভিড ও বিনয়বাবু বাহির হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বিনয়বাবু বললেন—আমরা এখন মোটরেই যাই, শেষে নন্দীগড়ের মাইল-খানেক আগে একটা স্থবিধা মত জায়গা দেখে সেখানে মোটর রেখে হেঁটে এগুবো—

ডেভিড হাসলো, বললো—আপনি যা বলেন আমি তাই করবো—সরোজের জন্যে আমি সব কিছুই করতে রাজী আছি, সরোজকে খুঁজে বের করা চাই!

—নিশ্চয়ই! অমন বন্ধু আমাদের আর হবে না।

—বন্ধু!

সহসা পিছনে সরোজের স্বর শুনে তু'জনে চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখে সরোজ পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, এক হাতে তার এটাচি কেস্, আরেক হাতে পিস্তল।

পিস্তলটা ডেভিড ও বিনয়বাবুর কপালের দিকে তুলে ধরে রুক্ষ কণ্ঠে সরোজ বললো—আমি আর তোমাদের বন্ধু নই, তোমাদের বন্ধুত্বে আমার আর দরকার নেই, এখন থেকে তোমরা আমায় পরম শত্রু বলেই জানবে—

কথাগুলি এমন রূঢ় এবং সরোজের মত বন্ধুর মুখ থেকে এমন অপ্রত্যাশিত যে, ডেভিড কি বিনয়বাবু কারও মুখে কিছুক্ষণ কোন কথা জোগালো না।

শেষে ডেভিড্ কথা বললো, বললো—আরে! থ্রি চিয়ার্স ফর ইউ, হুররে! তোমার জন্য এখুনি আমরা নন্দীগড় যাবার যোগাড় করছিলুম, আর তু'-তিন মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তুম, খুব সময় এসে পড়েছ যাহোক!

—হ্যাঁ, খুব সময়েই এসে পড়েছি! কেন এসেছি জানো?—তোমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। তোমাদের সব টাকাকড়ির এক তৃতীয়াংশের মালিক আমি; তোমরা তু'জনে শঠতা করে আমায় এদ্দিন ফাঁকি দিয়ে এসেছ, আজ সেই অংশ বুঝে নিয়ে চললুম।

ডেভিড্ ভাবলো, সরোজ এতক্ষণ তাদের সঙ্গে থিয়েটারী কায়দায় অভিনয়

করে যাচ্ছে, হেসে বললো—ঠাট্টা রাখো ; এসো বসো,—আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি ? বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে উধাও হয়ে গেয়েছিলে কোথায় ?

আগের মতই রুক্ষ স্বরে সরোজ বললো—তোমাদের অতো কথা বলার মত প্রচুর সময় আমার এখন নেই। আমি চললুম। সিন্দুক খুলে গয়না-পত্র সব নিয়ে যাচ্ছি, আমার নায্য পাওনা সব মিটে গেল—বলে সরোজ যেমন অকস্মাৎ এসেছিল, তেমনি অকস্মাৎ বাহির হয়ে গেল।

ডেভিড্ ও বিনয়বাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নেবার আগেই বাইরে মোটরে স্টার্ট দেবার শব্দ হোল। বিনয়বাবু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, ছুটে বাহিরে এসে ডাকলেন—সরোজ ! সরোজ !!

—হুম্ ! হুম্ !!

দুটী ডাকেরই জবাব এল। তবে মুখের কথায় নয়, পিস্তলের গুলিতে।

গুলি দুটি চলতি মোটর হতে ছোঁড়া হয়েছিল বলেই সে-যাত্রা বিনয়বাবু বেঁচে গেলেন। না হলে কি যে হত, বলা যায় না।

বিনয়বাবুর পিছনে ডেভিডও ছুটে বাহিরে এসেছিল। তাদের পাশ দিয়ে দুটি গুলি দেওয়ালে এসে ধাক্কা খেল। দেওয়ালে নীলাভ সাদা দুটী দাগ পড়লো। তাদের লক্ষ্য করে যে সরোজের হাতের পিস্তল হতে গুলি ছুটে আসতে পারে, তা ডেভিডের জীবনে শুধু বিস্ময়করই নয়, ধারণারও অতীত।

সরোজের মোটরের পিছনের লাল আলোটী পথের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে কতকক্ষণ তারা সেই ভাবেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আচম্বিতে উপর হতে সনির গলা পেয়ে তারা চমকে উঠলো—কাকামণি ! কাকামণি !!

সনি যে একা উপরে আছে, সরোজের আকস্মিক আবির্ভাবের বিস্ময়ে ডেভিড্ ও বিনয়বাবু তা ভুলেই গিয়েছিলেন। সনির ডাক শুনে দু'জনের বিস্ময়ের তন্দ্রা টুটে গেল। মুখে কেউ কোন কথা বললো না, তরতর করে একেবারে উপরে উঠে গেল। উপরের ঘরে ঢুকে দেখে সিন্দুক খোলা। সনি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ! মুখেও বাঁধন ছিল, সেটা টেনে সরিয়ে, সে চীৎকার করে তাদের ডেকেছে।

বাঁধন খুলে দেবার সময় সনি গরগর করে অনেক কথাই বললো, বললো—সবে

পড়তে বসেছি এমন সময় বাইরের বারান্দায় কিসের যেন একটা শব্দ শুনলুম, ভাবলুম আপনারা কেউ হবেন হয়তো। সহসা পিছনে সরোজদা'র চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—'চুপ করে থাকো, নাহলে অনিষ্ট হবে!' পিছু ফিরে দেখি সরোজদা পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখের চেহারা দেখে সত্যি আমার



ভয় হোল! সেই ফাঁকে সরোজদা' আমার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেললেন। তারপর আমায় এখানে ফেলে রেখে, সিন্দুক খুলে যে সব গয়নাপত্তর ছিল—সব বের করে নিয়ে একটা এটাচিকেসে ভরে নীচে চলে গেলেন। ভাবলুম নীচে আপনাদের সাবধান করে দি, কিন্তু চীৎকার করার উপায় ছিল না, মুখের মধ্যে কাপড় ঠাসা ছিল। ইতিমধ্যে তিনবার পিস্তলের শব্দ পেলুম। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলুম না। এদিকে ততক্ষণে চেষ্টা করে মুখের বাঁধনটা সরিয়ে ফেলেছি, মুখের ভিতর থেকে কাপড় বের করে আপনাদের ডাকলাম—

বিনয়বাবু বললেন—বেশ করেছ, তোমার কথা আমরা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম।

সনির বাঁধন খুলে দিয়ে সকলে মিলে সিন্দুকের কাছে গেল। সিন্দুক খালি। সিন্দুক ভর্তি গহনা ছিল। স্বর্গগতা মায়ের গহনাগুলি স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে বিনয়বাবু যত্ন করে সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন। সেগুলি সব সরোজ নিয়ে গেছে।

সনি বললো—আচ্ছা, গয়না তো সব নিয়ে গেছেন, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র তো কিছু যায় নি?

—সেগুলো নিলেই তো আর টাকা পাওয়া যাবেনা, বরং ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করে আনার সময় ধরা পড়ার সম্ভাবনাই বেশী—ডেভিড বললো।

বিনয়বাবুর মুখ তখন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে, লাল-নীল ভেল্‌ভেটের গহনার বাক্সগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন—সরোজ শেষে এমন করলে! সরোজের কাছ থেকে এতটা তো আমরা আশা করিনি, আমায় বললেই তো নগদ টাকা দিয়ে দিতুম,—দোবনা তো কখনও বলিনি। আমার মায়ের গয়নাগুলো এমনভাবে নিয়ে গেল!

ডেভিড বললো—সবটাই যে সরোজের দোষ, আমার তা ঠিক মনে হচ্ছে না, ব্যাপারটা আমার কেমন যেন খট্‌কা বাধ্‌ছে। সরোজ তো এমন ধরণের মানুষ নয়, আমি তো জানি!

—জানি মানে? চোখের সামনে দেখেও তুমি তোমার বন্ধুকে good characterএর সার্টিফিকেট্ দেবে?

—না না, তা নয় আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি কি, যে লোক নিজের জীবন তুচ্ছ করেও আমাদের জীবন রক্ষা করেছে, সে কখনও স্বেচ্ছায় আমাদের অনিষ্ট করবে,—এ কথা বিশ্বাস করতে আমার মন চায় না।

—চোখের সামনে দেখেও তুমি অস্বীকার করবে?

—অস্বীকার তো আমি কর্ছি না, তবে স্বীকার করার আগে, সরোজের চরিত্রের হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন হোল সেই কারণটা অনুসন্ধান করে দেখতে চাই।

—আমাদের আর অনর্থক হয়রাণ হয়ে লাভ কি? পুলিশে খবর দিলেই তারা সব বের করবে।

—পুলিশে খবর দিলেই কি গয়নাগুলো উদ্ধার হবে,-হয়তো সারা জীবনেই সে গয়নাগুলো পুলিশ উদ্ধার করতে পারবে না।

—তবে তুমি কি করতে বল?

—নতুন কিছুই নয়, আমাদের যেমন কথা ছিল তেম্‌নি ভাবেই কাজ করতে বলি।

—কি কথা ছিল?

—নন্দীগড়ে যাবার কথা ছিল।

—এই ঘটনার পর তুমি কি পুলিশে খবর না দিয়ে আগে নন্দীগড় যেতে বল?

—হ্যাঁ। পুলিশ তো খবর পেয়ে এখনিই গয়নাগুলো উদ্ধার করে আনবে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডায়েরী করলেও তো চলবে। এখন আগে আমাদের নন্দীগড়ে যাওয়াই দরকার। সেইখান থেকেই সরোজ নিরুদ্দেশ হয়। ওইখানেই কোথাও একটা আড্ডা আছে। সরোজ এইসব গয়না-পত্তর নিয়ে যদি কোথাও যায় তো খুব সম্ভব সেই নন্দগড়ের আড্ডাতেই যাবে। এখনই যদি আমরা পঞ্চাশ মাইল বেগে মোটর চালাই, তাহলে চাই কি শেষ পর্যন্ত সরোজের মোটর হয়তো পথেই ধরে ফেলতে পারি। তাহলে তো আজ এখনই গয়নাগুলো উদ্ধার হবে, পুলিশ কি তা পারবে? আর এখন যদি পুলিশ ডাকেন তো কথার পর কথার জবাবদিহি করতে করতেই রাত বারোটা বাজবে, এদিকে গয়নাগুলো উদ্ধারের আশাও কমে যাবে।

—বেশ তুমি যখন বলছ, তাই চলো।

গড্‌রেজে চাবি বন্ধ করে বিনয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন।

—তিন—

মোটরে ছ'জন যাত্রী—ডেভিড ও বিনয়বাবু।

ডেভিডের পায়ে মোটরের গতি, হাতে চলার নির্দেশ। ঝড়ের মত মোটর ছুটছে—

মুখর কলিকাতা মূক হয়ে গেছে। রাত্রির অন্ধকার শহরের গলা টিপে ধরে কণ্ঠরোধ করেছে। পথের আলোর নীচে চলন্ত নাগরিকের ভীড় আর নেই। দু'পাশের বিপণির চাকচিক্য এখন আর চোখে ধাঁধা লাগায় না। এই খানিক আগেও যে গৌরব নিয়ে মহানগরী ঝল্‌মল্ করছিল, সহসা যেন আলাদিনের কোন মায়াপ্রদীপের স্পর্শে সে সব উবে গেছে। সঙ্গীহীন ইলেক্‌ট্রিকের আলোগুলি বিষণ্ণদৃষ্টিতে চেহে আছে। শহর এখন মরে গেছে। মৃত শহরের বুকে অতীত জাঁক-জমকের সাক্ষ্য দিচ্ছে মাঝে মাঝে দু-একখানি পান-বিড়ির দোকান, খাবারের দোকান, থিয়েটার ও বায়োস্কোপ গৃহগুলির রঙীন আলো।—সব পিছনে ফেলে মোটর ছুটছে—পায়ের মৃদু আঘাতে চারখানি চাকা নিঃশব্দে ঘুরে চলছে,—বিরাম নাই।

রাজপথের বুক চিরে মোটর ছুটছে—ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে।

সাম্‌নের সুদূর পথ নিকট হতে নিকটতর, নিকটতম হয়ে চাকার নীচ দিয়ে পিছনে আবার সুদূর থেকে সুদূরতম হয়ে অন্ধকারে মিলিয়া যাচ্ছে।

পিচ্‌ঢালা শহরের পথ দেখতে দেখতে পল্লীর ধূসর পথে এসে মিলে গেল। মেঠো পথের ধূলা মোটরের পিছনে ধূসরিত হয়ে উঠছে। বিদ্যুৎ-বাতির পর গ্যাসের আলো, শেষে তাও ফুরিয়া এখন কেরোসিন তৈলের স্তিমিত-প্রায় লণ্ঠন দেখা দিয়াছে। কোন এক স্থানে দোতলা তিনতলা বাড়ীর সারি শেষ হয়ে শ্যামল বনানীবহুল পথের পাশে মাঝে মাঝে দু' একখানি কুটীর চোখে পড়ে। বর্তমানকে ফাঁকি দিয়ে এই বিংশশতাব্দীর সভ্যতার জাঁকজমক, বাড়ী-গাড়ী-আলো থেকে মোটরখানি যেন পুরাণো যুগে ফিরে যাচ্ছে।

চলেছে তো চলেছেই। পথের যেন আর শেষ নাই। উঁচুনীচু অসংখ্য ঝাঁকানিময় পথ, উল্‌টে যাবার ভয়ে হেড্‌ লাইট্‌ জেলে ধীরে ধীরে সাবধানে অগ্রসর হতে হয়।

কতকক্ষণ চলার পর একটা লেভেল্‌-ক্রসিংয়ের কাছে তারা এসে পড়লো। এইমাত্র একখানি ট্রেণ চলে গেছে, এখনও তার হুম্‌হুম্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ক্রসিংয়ের ফটক এতক্ষণ বন্ধ ছিল। সামনে একখানা মোটর দাঁড়িয়েছিল। ফটক খুলে দিতেই সামনের মোটরখানি তীরের মত ছুটে চলে গেল। ডেভিডদের মোটর তখনও ক্রসিংয়ের কাছে আসেনি। আগের ছুটন্ত মোটরখানি দেখে বিনয়বাবু বললেন—ওখানা সরোজের মোটরের মত, না?

—হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হচ্ছে। ওরই পিছনে যাই, কি বলেন?

—নিশ্চয়ই।

সামনের মোটরের লাল আলোটীর পশ্চাতে পিছনের মোটরটী ছুটে চললো।

সামনের মোটরখানি যেন ঝড়। অন্ধকারে মেঠো পথের উপর দিয়ে যে ভাবে ছুটে চলছে তাতে যে কোন মুহূর্তে কোন গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে, কি খানায় পড়ে মোটরখানি চূর্ণ হয়ে যেতে পারে। প্রথম মোটরখানির পিছনে ততো বিপজ্জনকভাবে গাড়ী চালাতে ডেভিড ভয় পেল, বললো—এই অন্ধকারে অমন বিশ্রী ভাবে মোটর চালাচ্ছে, সুস্থ মনে এমন ভাবে কেউ মোটর চালাতে পারে না…

—আমাদের খুব সম্ভব ভুল হয় নি। ওইটে নিশ্চয়ই সরোজের গাড়ী।

আমাদের চোখের আড়ালে পালাবার জন্যেই অম্‌নি ভাবে গাড়ী চালাচ্ছে, দেখো কোন মতেই ও যেন চোখের আড়ালে যেতে না পারে।

—কিন্তু এই বিশ্রী অজানা পথে এই অন্ধকারে অতো জোরে মোটর চালাই কেমন করে?

বিনয়বাবু হাসলেন, বললেন—তুমিই না যুদ্ধের সময় এরোপ্লেন চালাতে? আর এই সামান্য পথ, তার উপর আগে-আগে একখানা মোটর তো পথ দেখিয়েই চলেছে—

সহসা প্রথম মোটরখানির গতি কমে গেল। ডেভিডদের মোটরখানি তার কাছে এসে পড়তেই প্রথম মোটরখানি হতে একখানি মুখ বাহির হোল, হেড্‌ লাইটের আলোয় সে-মুখ দেখেই বিনয়বাবু ও ডেভিড এক সঙ্গেই বলে উঠলো—সরোজ!

সেই মুহূর্তে ফট্‌ফট্‌ করে কয়েকটি গুলি এসে মোটরের সাম্‌নের কাচখানি ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙ্গে ফেললো। তার পরেই সরোজের গলা শোনা গেল—get back, you fools, get back!

ডেভিড চীৎকার করে ডাকলো—সরোজ—সরোজ—!

উত্তরে একটা অট্টহাসির রেশ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। পরমুহূর্তেই সরোজের মোটর আবার পূর্ণবেগে ছুটতে সুরু করলো।

তারপর আবার···সেই রাত্রির অন্ধকার···সেই উঁচু নীচু মেঠো পথ··· সামনে ও পিছনে সেই দু'খানি ছুটন্ত মোটর গাড়ীর রেস্‌···সেই ঝড়ের গতি··· সেই পূর্ণবেগে ঘূর্ণমান চাকার ঘস্‌ঘস্‌ শব্দ···সেই বনানীর মর্মর···সেই মেঠো ধূলার ঝাপ্‌টা···এ যেন আর থামবে না!

বিনয়বাবু বললেন—দেখো ডেভিড্‌ মোটরখানা ধরা চাই-ই, ও কতক্ষণ চলে চলুক না, পেট্রল তো একবার ফুরোবেই—

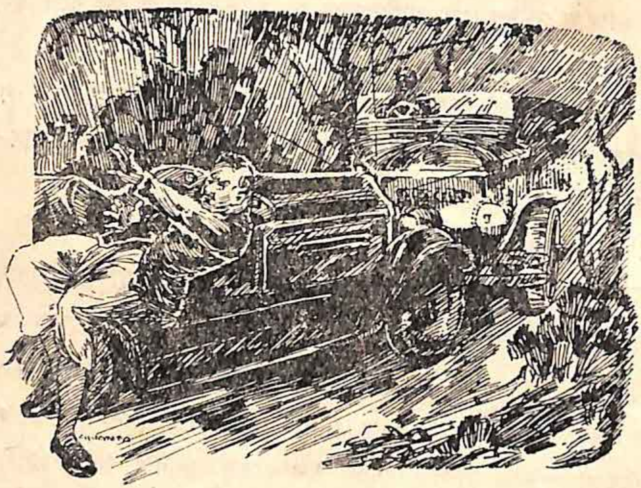
ডেভিড হাসলো, বললো—ওদের আগে ফুরোবে কি আমাদের আগে ফুরোবে, কি করে বুঝলেন?

—তা বটে···

—আহা-হাঃ, সামলে!···লাফিয়ে পড়ুন, লাফিয়ে পড়ুন—বলে ডেভিড আর দাঁড়ালো না, অপেক্ষা করার অবসরও তখন আর ছিল না, মোটরের দরজা খুলে সে ছিট্‌কে লাফিয়ে পড়লো।

দুর্যোগটী সরোজ ইচ্ছা করেই ঘটালো। যখন সে দেখলো পিছনের মোটর-খানিকে কোন রকমেই ফাঁকি দেওয়া যাচ্ছে না, এদিকে পেট্রলের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। তখন মরিয়া হয়ে উঠে সহসা একটা প্রশস্ত পথের মোড়ে ক্ষিপ্রভাবে মোটরখানি সে ঘুরিয়ে নিল তারপরেই পিছনের মোটরের মুখোমুখি এগিয়ে এল।

সরোজের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ডেভিড বিনয়বাবুকে সাবধান করে দিয়ে ব্রেক কষেই মোটর হতে লাফিয়ে পড়লো। বিনয়বাবু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হতচকিত হয়ে কয়েক সেকেণ্ড দেরী করে ফেললেন। তার পর যখন সবেমাত্র



দরজা খুলে পাদানিতে এসে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় সরোজের মোটর এসে তাদের মোটরে ধাক্কা মারলো। বিনয়বাবু ছিট্‌কে পড়ে গেলেন। মোটরখানি উল্টে গেল।

একটা প্রচণ্ড হুড়মুড় শব্দে রাত্রির অন্ধকারে নিস্তব্ধ পল্লী সচকিত হয়ে উঠলো, মাটির বুকে গুম্‌গুম্ করে প্রতিধ্বনি উঠলো।

পথের পাশে নালার মধ্যে পাঁক জমে আছে, তার উপর থিতিয়ে আছে নর্দমার নোংরা দুর্গন্ধময় জল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ডেভিড্ লাফিয়ে পড়েছিল এই নালার ঢালু কিনারার উপরে। সহসা ঢালু জমির উপর পড়লে

দেহের সমতা রাখা অসম্ভব হয়ে উঠে, ডেভিডও নিজেকে ঠিক রাখতে পারলো না, একেবারে উল্টে গিয়ে পড়লো নর্দমার পাঁকের মধ্যে।

পাঁকের মধ্যে পড়লো বলেই ডেভিড্ সে-যাত্রা রক্ষা পেল, না হলে হাত-পা ভেঙ্গে কি যে হত বলা যায় না। যাক্, প্রথম ঝুঁকিটা কেটে যেতেই খানিকক্ষণ চেষ্টা করে ডেভিড যখন নালার পাঁক হতে উপরের পথে উঠে এল তখন বেচারার শাদা ধব্‌ধবে কাপড়জামার রং একেবারে বদলে গেছে। সর্বাঙ্গে পাঁকের উৎকট দুর্গন্ধে বমি হবার উপক্রম হোল। আঙ্গুল দিয়ে জামা কাপড় হতে খানিক পাঁক চেঁচে ফেলে, রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নেবার পরও সে-পাঁকের গন্ধ যেন কিছুতেই আর দেহ থেকে ছাড়তে চায় না। দুর্গন্ধ না ছাড়ুক, ওই সামান্য দুর্গন্ধ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ডেভিডের তখন নেই। অন্ধকার রাতে এই গেঁয়ো পথে, মোটরখানির ধাক্কা খেয়ে অচল হয়ে যাবার পর এখন তার কি কর্তব্য ডেভিড তাই ভেবে নেবার চেষ্টা করলো।

দূরে একখানি মোটর চলে যাবার শব্দ শোনা গেল। সেদিকে তাকিয়ে অন্ধকার মাঠ, বনানী আর আকাশের অস্পষ্ট তারা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কতো দূরে কোন পথ দিয়ে একখানি মোটর চলে যাচ্ছে নিস্তব্ধ পল্লীর আকাশ বাতাস সচকিত করে তার প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে। আহাঃ! ওই মোটরখানি যদি এই পথে আসতো! হতাশভাবে ডেভিড একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো!

মোটরটি কিন্তু সেই পথেই আসছিল। পুরাণো মোটরের ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো! ডেভিডের মনে আশার সঞ্চার হোল, পল্লীর এই অন্ধকার পথে দেবতার আশীর্বাদের মত মোটরখানি এই পথে আসছে, সাহায্য পাবার হয়ত সুবিধা হবে।

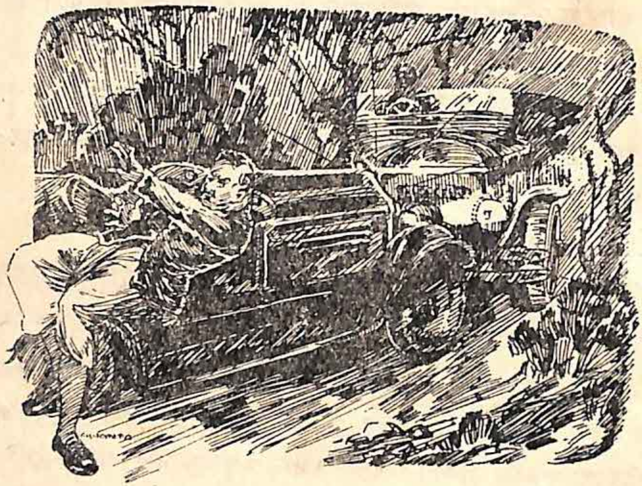
দেখতে দেখতে অত্যন্ত কাছে ঘস্‌স্ করে ব্রেক কষে মোটর থামার শব্দ হোল। মোটর থামলো, এতো রাতে এই গেঁয়ো পথে মোটর চালাচ্ছে অথচ একটা আলোও নেই! তবে কি এদের কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে? তাই যদি হয়, তা হলে প্রথমেই এদের কাছে সাহায্য চাইতে না গিয়ে, আড়ালে লুকিয়ে এদের চালচলন লক্ষ্য করাই উচিত। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই চলবে।

ডেভিড আবার পথের পাশে নালায় গিয়ে নামলো।

একটু পরেই টর্চের আলো দেখা গেল। ধাক্কা-লাগা মোটর দু'খানির পাশে

দুর্যোগটা সরোজ ইচ্ছা করেই ঘটালো। যখন সে দেখলো পিছনের মোটর-খানিকে কোন রকমেই ফাঁকি দেওয়া যাচ্ছে না, এদিকে পেট্রলের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। তখন মরিয়া হয়ে উঠে সহসা একটা প্রশস্ত পথের মোড়ে ক্ষিপ্রভাবে মোটরখানি সে ঘুরিয়ে নিল তারপরেই পিছনের মোটরের মুখোমুখি এগিয়ে এল।

সরোজের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ডেভিড বিনয়বাবুকে সাবধান করে দিয়ে ব্রেক কষেই মোটর হতে লাফিয়ে পড়লো। বিনয়বাবু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হতচকিত হয়ে কয়েক সেকেণ্ড দেরী করে ফেললেন। তার পর যখন সবেমাত্র



দরজা খুলে পাদানিতে এসে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় সরোজের মোটর এসে তাদের মোটরে ধাক্কা মারলো। বিনয়বাবু ছিট্‌কে পড়ে গেলেন। মোটরখানি উল্টে গেল।

একটা প্রচণ্ড হুড়মুড় শব্দে রাত্রির অন্ধকারে নিস্তব্ধ পল্লী সচকিত হয়ে উঠলো, মাটির বুকে গুম্‌গুম্ করে প্রতিধ্বনি উঠলো।

পথের পাশে নালার মধ্যে পাঁক জমে আছে, তার উপর থিতিয়ে আছে নর্দমার নোংরা দুর্গন্ধময় জল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ডেভিড্ লাফিয়ে পড়েছিল এই নালার ঢালু কিনারার উপরে। সহসা ঢালু জমির উপর পড়লে

দেহের সমতা রাখা অসম্ভব হয়ে উঠে, ডেভিডও নিজেকে ঠিক রাখতে পারলো না, একেবারে উল্টে গিয়ে পড়লো নর্দমার পাঁকের মধ্যে।

পাঁকের মধ্যে পড়লো বলেই ডেভিড্ সে-যাত্রা রক্ষা পেল, না হলে হাত-পা ভেঙ্গে কি যে হত বলা যায় না। যাক্, প্রথম ঝুঁকিটা কেটে যেতেই খানিকক্ষণ চেষ্টা করে ডেভিড যখন নালার পাঁক হতে উপরের পথে উঠে এল তখন বেচারার শাদা ধব্‌ধবে কাপড়জামার রং একেবারে বদলে গেছে। সর্বাঙ্গে পাঁকের উৎকট দুর্গন্ধে বমি হবার উপক্রম হোল। আঙ্গুল দিয়ে জামা কাপড় হতে খানিক পাঁক চেঁচে ফেলে, রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নেবার পরও সে-পাঁকের গন্ধ যেন কিছুতেই আর দেহ থেকে ছাড়তে চায় না। দুর্গন্ধ না ছাড়ুক, ওই সামান্য দুর্গন্ধ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ডেভিডের তখন নেই। অন্ধকার রাতে এই গেঁয়ো পথে, মোটরখানির ধাক্কা খেয়ে অচল হয়ে যাবার পর এখন তার কি কর্তব্য ডেভিড তাই ভেবে নেবার চেষ্টা করলো।

দূরে একখানি মোটর চলে যাবার শব্দ শোনা গেল। সেদিকে তাকিয়ে অন্ধকার মাঠ, বনানী আর আকাশের অস্পষ্ট তারা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কতো দূরে কোন পথ দিয়ে একখানি মোটর চলে যাচ্ছে নিস্তব্ধ পল্লীর আকাশ বাতাস সচকিত করে তার প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে। আহাঃ! ওই মোটরখানি যদি এই পথে আসতো! হতাশভাবে ডেভিড একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো!

মোটরটি কিন্তু সেই পথেই আসছিল। পুরাণো মোটরের ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো! ডেভিডের মনে আশার সঞ্চার হোল, পল্লীর এই অন্ধকার পথে দেবতার আশীর্বাদের মত মোটরখানি এই পথে আসছে, সাহায্য পাবার হয়ত সুবিধা হবে।

দেখতে দেখতে অত্যন্ত কাছে ঘস্‌স্ করে ব্রেক কষে মোটর থামার শব্দ হোল। মোটর থামলো, এতো রাতে এই গেঁয়ো পথে মোটর চালাচ্ছে অথচ একটা আলোও নেই! তবে কি এদের কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে? তাই যদি হয়, তা হলে প্রথমেই এদের কাছে সাহায্য চাইতে না গিয়ে, আড়ালে লুকিয়ে এদের চালচলন লক্ষ্য করাই উচিত। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই চলবে।

ডেভিড আবার পথের পাশে নালায় গিয়ে নামলো।

একটু পরেই টর্চের আলো দেখা গেল। ধাক্কা-লাগা মোটর দু'খানির পাশে

টর্চের আলো ফেলে ছুটী লোক কি যেন দেখলো। তারপর তারা বিনয়বাবুর অচৈতন্য দেহ নিজেদের মোটরে রেখে ফিরে এসে আবার টর্চের আলোয় কার যেন খোঁজ করতে লাগলো।

একজনের গলা শোনা গেল—ওদের গাড়ীতে দু'জন ছিল, না একজন ?

—দু'জন দেখেছিলাম।

—আরেকজন গেল কোথায় ? এমন মোটরের ধাক্কা সামলে এর মধ্যেই পালালো ?

—একজন অজ্ঞান বন্ধুকে ফেলে পালাবার ছেলে সে নয়। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও পড়ে আছে, আসুন দিকি একবার ওপাশের নালাটি দেখি—

লোক ছুটী নালার দিকে আসছে দেখে ডেভিড্ চোখ বুঁজে শক্ত হয়ে অজ্ঞানের মত পড়ে রইল।

পায়ের শব্দ নালার পাশে এসে থামলো।

একঝলক বৈদ্যুতিক মশালের আলো এসে পড়লো ডেভিডের মুখের উপর।

কেউ কোন কথা বললো না। ছুটী লোক এগিয়ে এসে ডেভিড্কে তুলে নিয়ে এল মোটরে। তারপর মোটর ছাড়লো।

যেমন অন্ধকারে মোটরখানি এসেছিল, তেমনি অন্ধকারে মোটরখানি ফিরে চললো।

সাবধানে সন্তর্পণে ডেভিড মিট্ মিট্ করে তাকালো। ভাল করে কিছুই বুঝতে পারলো না। সহসা একচোখো একটা ভূতের মত পথের পাশে কেরোসিন তেলের একটা আলো মোটরের পাশ দিয়ে পিছন দিকে ছুটে গেল। সেই ক্ষণিক স্তিমিত আলোয় আবছায়ার মত ডেভিড দেখতে পেল ছুটন্ত মোটরের মধ্যে পিছনের সিটের পা-রাখার-জায়গায় সে পড়ে আছে। উপরের বসবার আসন হতে খানিকটা কাপড় ঝুলে পড়েছে তার গায়ের উপর। অন্ধকারে একটা হাত চকিতে একবার উপরে তুলে ডেভিড্ সেই কাপড়টায় সাবধানে একটা টান মারলো। টানটা বোধ হয় একটু জোরেই হয়েছিল, থপ করে কি একটা জিনিষ একেবারে এসে পড়লো ডেভিডের মুখের উপর। ডেভিড চমকে উঠলো। চোখ বুঁজিলো।

চুপচাপ ক'মিনিট কেটে গেল। মুখের উপর হতে জিনিষটা না সরালে আর স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। ডেভিড্ একবার মাথা নাড়লো। একটী ঝট্কা মারলো।

তথাপি মুখের উপর হতে সেটা সরেও না, পড়েও না। ডেভিড্ এবার হাত দিয়ে জিনিষটা সরাবার চেষ্টা করলো। হাত দিয়েই সে বুঝলো, এতক্ষণ সে যা ভেবেছিল তা নয়, তার মুখের উপরে যা এসে পড়েছে, সেটা একটা লোকের হাত। যা সে কাপড় মনে করেছিল, তা পাঞ্জাবীর হাতা—খদ্দরের পাঞ্জাবী। খদ্দরের পাঞ্জাবী-পরা হাত।...তা হলে এ আর কারুরই নয়, বিনয়বাবুরই। তারই উপরে বসবার আসনে বিনয়বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

কিছুটা পথ এসে মোটর থামলো।

চালকের আসন হতে লোক দুটী নেমে এসে অন্ধকারেই বিনয়বাবুর অজ্ঞান দেহটা তুলে নিয়ে চলে গেল—কাছাকাছি কোথায় যেন রাখতে গেল।

তারা বিনয়বাবুর অজ্ঞান দেহটা ধরাধরি করে মোটর হতে নামবামাত্রই ডেভিড উঠে বসলো। তারপর মোটর হতে নেমে তাদের পিছু পিছু অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল।

বড় বেশী হলে মিনিট দুয়েক হবে।

দু-মিনিট পরেই একটা আর্ত চীৎকার সেখানকার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ডেভিডের কানে এসে ধাক্কা দিল, সেরকম করুণ চীৎকার ডেভিড কোনদিন শোনেনি, কি যেন এক আতঙ্কে তার গা ছম্‌ছম্ করে উঠলো।

ডেভিড আর সেখানে দাঁড়ালো না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্ধকারের মধ্যেই এগিয়ে চললো। চলতে চলতে তার কানে এসে বাজলো জলস্রোতের মৃদু ছল্‌ছল্ শব্দ, গায়ে এসে লাগলো জলো হাওয়া; ডেভিড বুঝলো, গঙ্গার তটের কাছাকাছি কোথাও সে এসে পড়েছে—এখানে তো আর অন্য কোন নদী নেই।

সহসা পিছনে সে পায়ের শব্দ শুনতে পেল, আর তারই সঙ্গে শুনতে পেল লোকের কথা—কি রে, লোকটা কি এক মিনিটে উপে গেল নাকি?

—তাইতো দেখছি, একেবারে ভোজবাজী!

—ভোজবাজী না ছাই, এই ফাঁকা মাঠে কোথায় পালায় দেখছি, টর্চটা জালতো—

ডেভিড ততক্ষণে ছুটতে সুরু করেছে। খানিকটা এসেই ঢালু ভিজে মাটি, সেখান দিয়ে তরতর করে নেমে ডেভিড একেবারে জলের কিনারায় এসে দাঁড়ালো।

ঠিক সেই মুহূর্তেই টর্চের আলোয় গঙ্গার তট উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সেই আলোয় পিছনের লোক ছুটী গঙ্গার তটের উপর দাঁড়িয়ে-থাকা ডেভিডকে স্পষ্ট দেখতে পেল—ওই যে,—ওই !

লোক ছুটি ছুটে এল ডেভিডকে ধরতে।

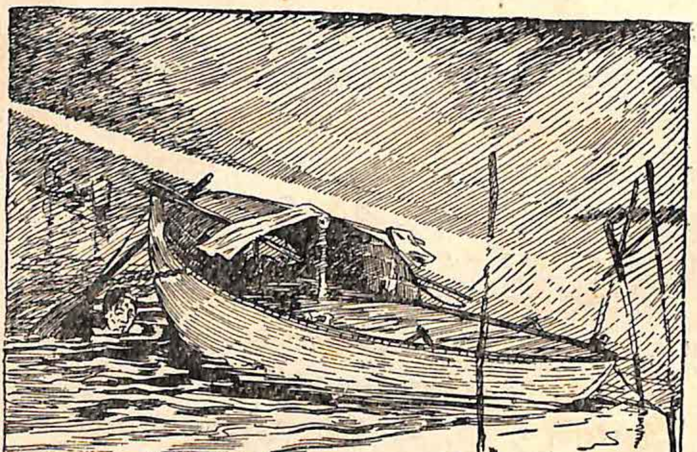
ডেভিড একবার পিছনের পানে চাইল, তারপর চাইল সামনের জলের পানে—মৃদু-ছল্‌ছলে কালো রহস্যময় জল অন্ধকারে আকাশের সঙ্গে কোথায় যেন মিশে গেছে। এই রাত্রে ওই জলের মধ্যে নামতে ইচ্ছা করে না কিন্তু এখানে সেই ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ভাবার সময় নাই, ডেভিড ঝুপ করে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। লাফিয়ে পড়েই ডুব, কালো জলের বুকে ডেভিডের মাথাটাও আর চোখে পড়লো না।

লোক ছুটি এগিয়ে এল।

টর্চের আলো ফেলে গঙ্গার জলস্রোতের বুকে কিছুক্ষণ নজর রাখলো।

ডেভিডের মুণ্ড কিন্তু ভাসলো না।

—লোকটা কি ডুবে গেল নাকি ?



—হয়তো ডুব-সাঁতার কেটে সরে পড়েছে—

—সরে পড়তে আর হবে না, জলের কিনারায় গিয়েছিল, কুমীরে টেনে নিয়ে গেছে হয়তো।

—থাক্‌গে, ব্যাটা যখন গ্যাছে যাক্‌···

লোক দুটি ফিরে গেল।

তটের অদূরে বাঁধা একখানি নৌকার আড়ালে ডেভিড তখন লুকিয়ে আছে।

লোক দুটি চলে যাবার পর ডেভিড জল হতে উঠে এল, তারপর সেই ভিজা কাপড় জামা নিয়ে কত কষ্ট সহে ডেভিড কলিকাতায় পৌছালো, তা সে-ই জানে।

—চার—

পরদিন—

সকাল তখন ন'টা হবে।

নন্দীগড়ে গঙ্গার ধারে একটী ছোট একতলা বাড়ী ভদ্রবেশী কয়েকজন পুলিস এসে ঘিরে ফেললো।

বাড়ীটির ভিতরে ঢুকতে কোন হাঙ্গামা হোল না। সামনেই বৈঠকখানা। ডেভিডই প্রথমে গট্‌গট্‌ করে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। পূরাদস্তুর সার্জেণ্টের পোযাক। পিস্তলটা পকেটে চেপে ধরে আছে, প্রয়োজন হলেই বাহির করবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে যাকে সে দেখতে পেল, তাকে সেখানে দেখবার সে মোটেই প্রত্যাশা করেনি। দেখলো সামনেই একখানি চেয়ারে বসে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে ইজেলে আট্‌কানো একখানি কাগজের উপর সরোজ তুলির আঁচড় টেনে চলেছে। ঘরটির চারিপাশের দেয়াল নানা রংয়ের হাতে-আঁকা ছবিতে ভরা।

ডেভিড ক' সেকেণ্ড থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অতগুলি লোকের পায়ের শব্দে শিল্পীর তন্ময়তা তখন ভেঙে গেছে, ছবি হতে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো—কে আপনারা? কি চাই?

—আরে সরোজ, আমি!

—আপনি কে?

সরোজ যে একদিন তাকে চিনতে পারবে না, বা ইচ্ছা করে চিনবে না, ডেভিড তা কোন দিন ভাবতে পারেনি। বিস্ময়ের উপরেও যদি কোন অবস্থা থাকে, ডেভিডের মন তখন সেই অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

যে ইন্সপেক্টার সঙ্গে এসেছিল, সে ডেভিডকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে

ঠিক সেই মুহূর্তেই টর্চের আলোয় গঙ্গার তট উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সেই আলোয় পিছনের লোক দুটী গঙ্গার তটের উপর দাঁড়িয়ে-থাকা ডেভিডকে স্পষ্ট দেখতে পেল—ওই যে,—ওই!

লোক দুটি ছুটে এল ডেভিডকে ধরতে।

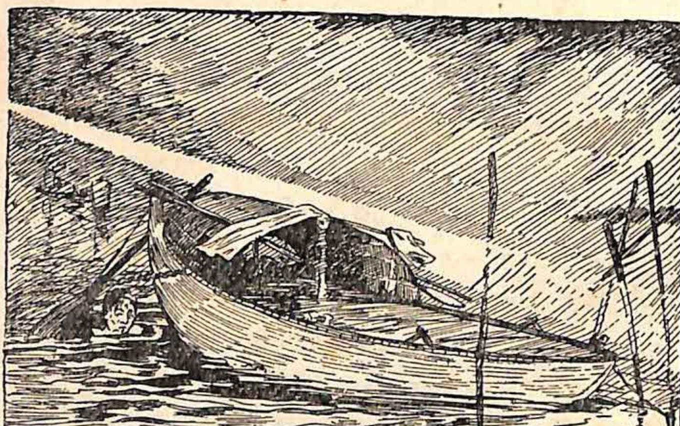
ডেভিড একবার পিছনের পানে চাইল, তারপর চাইল সামনের জলের পানে—মৃদু-ছল্‌ছলে কালো রহস্যময় জল অন্ধকারে আকাশের সঙ্গে কোথায় যেন মিশে গেছে। এই রাত্রে ওই জলের মধ্যে নামতে ইচ্ছা করে না কিন্তু এখানে সেই ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ভাবার সময় নাই, ডেভিড ঝুপ করে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। লাফিয়ে পড়েই ডুব, কালো জলের বুকে ডেভিডের মাথাটাও আর চোখে পড়লো না।

লোক দুটি এগিয়ে এল।

টর্চের আলো ফেলে গঙ্গার জলস্রোতের বুকে কিছুক্ষণ নজর রাখলো।

ডেভিডের মুণ্ড কিন্তু ভাসলো না।

—লোকটী কি ডুবে গেল নাকি?



—হয়তো ডুব-সাঁতার কেটে সরে পড়েছে—

—সরে পড়তে আর হবে না, জলের কিনারায় গিয়েছিল, কুমীরে টেনে নিয়ে গেছে হয়তো।

—থাক্‌গে, ব্যাটা যখন গ্যাছে যাক্‌…

লোক ছুটি ফিরে গেল।

তটের অদূরে বাঁধা একখানি নৌকার আড়ালে ডেভিড তখন লুকিয়ে আছে।

লোক ছুটি চলে যাবার পর ডেভিড জল হতে উঠে এল, তারপর সেই ভিজা কাপড় জামা নিয়ে কত কষ্ট সহে ডেভিড কলিকাতায় পৌছালো, তা সে-ই জানে।

—চার—

পরদিন—

সকাল তখন ন'টা হবে।

নন্দীগড়ে গঙ্গার ধারে একটী ছোট একতলা বাড়ী ভদ্রবেশী কয়েকজন পুলিস এসে ঘিরে ফেললো।

বাড়ীটির ভিতরে ঢুকতে কোন হাঙ্গামা হোল না। সামনেই বৈঠকখানা। ডেভিডই প্রথমে গট্‌গট্‌ করে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। পূরাদস্তুর সার্জেণ্টের পোষাক। পিস্তলটা পকেটে চেপে ধরে আছে, প্রয়োজন হলেই বাহির করবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে যাকে সে দেখতে পেল, তাকে সেখানে দেখবার সে মোটেই প্রত্যাশা করেনি। দেখলো সামনেই একখানি চেয়ারে বসে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে ইজেলে আট্‌কানো একখানি কাগজের উপর সরোজ তুলির আঁচড় টেনে চলেছে। ঘরটির চারিপাশের দেয়াল নানা রংয়ের হাতে-আঁকা ছবিতে ভরা।

ডেভিড ক' সেকেণ্ড থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অতগুলি লোকের পায়ের শব্দে শিল্পীর তন্ময়তা তখন ভেঙে গেছে, ছবি হতে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো—কে আপনারা? কি চাই?

—আরে সরোজ, আমি!

—আপনি কে?

সরোজ যে একদিন তাকে চিনতে পারবে না, বা ইচ্ছা করে চিনবে না, ডেভিড তা কোন দিন ভাবতে পারেনি। বিস্ময়ের উপরেও যদি কোন অবস্থা থাকে, ডেভিডের মন তখন সেই অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

যে ইন্সপেক্‌টার সঙ্গে এসেছিল, সে ডেভিডকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে

দেখে জিজ্ঞাসা করলো,—ইনিই কি আপনার বন্ধু সরোজবাবু, যিনি কাল রাত্তিরে আপনার বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন ?

ডেভিড মাথা নেড়ে জানালো—হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টারবাবু সরোজের কাছে গিয়ে বললো—সরোজবাবু, আপনাকে ডাকাতি করার অপরাধে গ্রেপ্তার করলাম।

—সরোজবাবু ?—সরোজবাবু কে ?

—আপনি !

—আমি ? সরোজবাবু আমার নাম নয়।

—বেশ। তাহলে আপনার নাম কি ?

—আমার নাম রবি দত্ত। আর্টিষ্ট রবি দত্ত। আমার আঁকা ছবি আপনি দেখেন নি 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসীতে' ?

—না, আপনার ছবি দেখার আমার দরকার হয়নি।

—এ্যাঁ, আমার ছবি আপনি দেখেন নি ? আমার ছবি দেখে রবি-ঠাকুর, অবনী-ঠাকুর, নন্দলাল বোস্, ও-সি-গাঙ্গুলি কত প্রশংসা করেছেন, আর আপনি বলছেন আমার ছবি দেখেন নি ! আমার অমন সব আর্টিষ্টিক্ ছবি—

—ও সব আর্টের কথা এখন ছাড়ুন।

—বলেন কি, আর্টের কথা ছেড়ে দেব ? আর্টের মধ্যেই তো জাতির কাল্চার, জাতীয় সভ্যতা ফুটে ওঠে—আর্ট ছাড়া কোন জাতি বাঁচতে পেরেছে আজ পর্যন্ত, আর্টই হচ্ছে জাতির প্রাণ।

—থাক্, আর্টের ব্যাখ্যা শুনতে আমি আপনার কাছে আসিনি, আমি এসেছি আপনার বাড়ী সার্চ্ করতে—

—আমার বাড়ী সার্চ্ করতে ? কেন ?

—শুধু সার্চ্ করতে নয়, আপনাকেও গ্রেপ্তার করতে।

—আমি কি অপরাধ করেছি জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

—কাল রাত্তিরে একটা ডাকাতি করেছেন···

—আমি ডাকাতি করেছি ? অবিশ্বাস্য, একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, আর্টিষ্ট্ কখনো ডাকাত হতে পারে ? একটা মিথ্যা সন্দেহে আপানারা আমাকে অনর্থক হয়রাণ করবেন। শিল্পী কখনো লোকের বুকে ছুরি মারতে পারে না, তা পারলে বাংলার অসংখ্য শিল্পীকে আজ দৈন্যের মাঝে অনাহার-অর্ধাহারে দিন

কাটাতে হোত না। ডাকাতি করতে জানলে আজ আমরা ব্যবসাদার হতাম; শিল্পী ও সাহিত্যিক হয়ে না খেয়ে মরতে বসতাম না—

—ওসব বক্তৃতা রেখে এখন চলুন দেখি, আপনার বাড়ীর ভিতরের ঘরগুলো সব সার্চ্ করে আসি—

—বেশ চলুন; আপনারা যখন ধরেছেন, সহজে তো ছাড়বেন না……

আর্টিষ্ট গজগজ করতে করতে পুলিশের লোকজনদের নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো।

বাড়ীতে একটী চাকর ছাড়া আর কেউ নেই।

সার্চ্ করার মত বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে দেখার মত জিনিষ ছিল: নামকরা শিল্পীদের আঁকা অসংখ্য ভাল ভাল বাঁধানো ছবি।

ইনেস্‌পেক্‌টার ডেভিডকে বললো—লোকটাকে খাঁটি আর্টিষ্ট বলেই তো মনে হচ্ছে, একে থানা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? যদি মানহানির মামলা করে?

—আমার দায়িত্বে আপনি ওকে গ্রেপ্তার করুন, মামলা যদি হয় আমি বুঝবো—

—বেশ, কিন্তু আপনার বাড়ী ভুল হয়নি তো? রাত্রির অন্ধকারে দেখেছেন?

—না, বাড়ী আমার ভুল হয় নি। তাছাড়া ওকে যে আমি চিনি। ও নিজেকে আর্টিষ্ট বলুক আর যা-ই বলুক, ও যে সরোজ সে সম্পর্কে আমার চোখকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না।

—বেশ!

ডেভিডের দায়িত্বে ইন্সপেক্‌টার আর্টিষ্ট রবি দত্তকে গ্রেপ্তার করলো।

—পাঁচ—

সেই দিনই বিকালের কথা—

কাশীপুর থানার হাজত ঘরে আর্টিষ্ট রবি দত্ত তখন চুপ করে বসে ছিল। বাড়ীর চাকরটা একটা টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে এসে দারোগাবাবুর কাছ থেকে অনুমতি চাইল—কিছু খাবার এনেছি দাদাবাবুর জন্য, আপনি যদি অনুমতি করেন—

দেখে জিজ্ঞাসা করলো,—ইনিই কি আপনার বন্ধু সরোজবাবু, যিনি কাল রাত্তিরে আপনার বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন?

ডেভিড মাথা নেড়ে জানালো—হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টারবাবু সরোজের কাছে গিয়ে বললো—সরোজবাবু, আপনাকে ডাকাতি করার অপরাধে গ্রেপ্তার করলাম।

—সরোজবাবু?—সরোজবাবু কে?

—আপনি!

—আমি? সরোজবাবু আমার নাম নয়।

—বেশ। তাহলে আপনার নাম কি?

—আমার নাম রবি দত্ত। আর্টিষ্ট রবি দত্ত। আমার আঁকা ছবি আপনি দেখেন নি 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসীতে'?

—না, আপনার ছবি দেখার আমার দরকার হয়নি।

—এ্যাঁ, আমার ছবি আপনি দেখেন নি? আমার ছবি দেখে রবি-ঠাকুর, অবনী-ঠাকুর, নন্দলাল বোস্, ও-সি-গাঙ্গুলি কত প্রশংসা করেছেন, আর আপনি বলছেন আমার ছবি দেখেন নি! আমার অমন সব আর্টিষ্টিক্ ছবি—

—ও সব আর্টের কথা এখন ছাড়ুন।

—বলেন কি, আর্টের কথা ছেড়ে দেব? আর্টের মধ্যেই তো জাতির কাল্চার, জাতীয় সভ্যতা ফুটে ওঠে—আর্ট ছাড়া কোন জাতি বাঁচতে পেরেছে আজ পর্যন্ত, আর্টই হচ্ছে জাতির প্রাণ।

—থাক্, আর্টের ব্যাখ্যা শুনতে আমি আপনার কাছে আসিনি, আমি এসেছি আপনার বাড়ী সার্চ্ করতে—

—আমার বাড়ী সার্চ্ করতে? কেন?

—শুধু সার্চ্ করতে নয়, আপনাকেও গ্রেপ্তার করতে।

—আমি কি অপরাধ করেছি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—কাল রাত্তিরে একটা ডাকাতি করেছেন···

—আমি ডাকাতি করেছি? অবিশ্বাস্য, একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, আর্টিষ্ট্ কখনো ডাকাত হতে পারে? একটা মিথ্যা সন্দেহে আপানারা আমাকে অনর্থক হয়রাণ করবেন। শিল্পী কখনো লোকের বুকে ছুরি মারতে পারে না, তা পারলে বাংলার অসংখ্য শিল্পীকে আজ দৈন্যের মাঝে অনাহার-অর্ধাহারে দিন

কাটাতে হোত না। ডাকাতি করতে জানলে আজ আমরা ব্যবসাদার হতাম; শিল্পী ও সাহিত্যিক হয়ে না খেয়ে মরতে বসতাম না—

—ওসব বক্তৃতা রেখে এখন চলুন দেখি, আপনার বাড়ীর ভিতরের ঘরগুলো সব সার্চ্ করে আসি—

—বেশ চলুন ; আপনারা যখন ধরেছেন, সহজে তো ছাড়বেন না······

আর্টিষ্ট গজগজ করতে করতে পুলিশের লোকজনদের নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো।

বাড়ীতে একটী চাকর ছাড়া আর কেউ নেই।

সার্চ্ করার মত বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে দেখার মত জিনিষ ছিল ঃ নামকরা শিল্পীদের আঁকা অসংখ্য ভাল ভাল বাঁধানো ছবি।

ইনেস্পেক্টার ডেভিডকে বললো—লোকটাকে খাঁটি আর্টিষ্ট বলেই তো মনে হচ্ছে, একে থানা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? যদি মানহানির মামলা করে?

—আমার দায়িত্বে আপনি ওকে গ্রেপ্তার করুন, মামলা যদি হয় আমি বুঝবো—

—বেশ, কিন্তু আপনার বাড়ী ভুল হয়নি তো? রাত্রির অন্ধকারে দেখেছেন?

—না, বাড়ী আমার ভুল হয় নি। তাছাড়া ওকে যে আমি চিনি। ও নিজেকে আর্টিষ্ট বলুক আর যা-ই বলুক, ও যে সরোজ সে সম্পর্কে আমার চোখকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না।

—বেশ!

ডেভিডের দায়িত্বে ইন্সপেক্টার আর্টিষ্ট রবি দত্তকে গ্রেপ্তার করলো।

—পাঁচ—

সেই দিনই বিকালের কথা—

কাশীপুর থানার হাজত ঘরে আর্টিষ্ট রবি দত্ত তখন চুপ করে বসে ছিল। বাড়ীর চাকরটা একটা টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে এসে দারোগাবাবুর কাছ থেকে অনুমতি চাইল—কিছু খাবার এনেছি দাদাবাবুর জন্য, আপনি যদি অনুমতি করেন—

দারোগা বাবু বললেন,—কি আছে দেখি ?

—গোটা ছুয়েক ডিম, কিছু মোহনভোগ আর ক'খানা লুচি।

—দেখি, এদিকে নিয়ে এস—

দারোগা বাবু টিফিন-কেরিয়ারটী খুলে একবার দেখে নিলেন। চাকরটি মিথ্যা বলে নি, হালুয়া, লুচি এবং ডিম ছাড়া আর কিছুই নেই। একজন আর্দালীকে ডেকে বললেন—এই, লে যাও হাজতমে, আর্টিষ্ট বাবুকা পাশ—

আর্দালী টিফিন-কেরিয়ারটী রবি দত্তকে পৌঁছে দিয়ে এল।

খাবার পেয়ে আর্টিষ্ট সানন্দে খেতে বসে গেল। কয়েকখানা লুচি খাবার পর একখানা লুচি ছিঁড়তেই, তার ভিতর হতে একখানি কাগজ বাহির হোল।

কাগজখানি বাহির করে আর্টিষ্ট দেখলো—একখানি চিঠি। তখনই আর্টিষ্ট চিঠিখানি পড়ে ফেললো—তিনটী লাইন মাত্র চিঠিতে লেখা আছে :

সন্ধ্যাবেলার কালো বাস
সামনের দিকে ডাহিনের কোণ
চিলা তক্তার নীচেই পথ—

আর্টিষ্ট একবার পড়লো, ছু'বার পড়লো, তিনবার পড়লো, একটু হাসলো। সহসা একটী আর্দালীর জুতার শব্দ পেয়ে চিঠিখানা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রেখে আবার খেতে সুরু করলো।

সেইদিনই আর্টিষ্ট রবি দত্তকে লালবাজারে চালান দেবার ব্যবস্থা হোল।

সন্ধ্যাবেলা লালবাজারের কালো রঙের চারিপাশ-ঢাকা প্রকাণ্ড বাসটী আর্টিষ্টকে তুলে নিয়ে যখন লালবাজারের দিকে আসছিল, পথে শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মোড়ে কয়েকখানি গরুর গাড়ী সামনে পড়ে যাওয়ায়, জেলের গাড়ীর চলা বন্ধ হয়ে গেল।

গাড়ীটী থেমে যেতেই ভিতরে একটী লোক উঠে দাঁড়ালো। এতক্ষণ সে যেন এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বসবার আসনের তক্তাখানা ধরে একটু টানাটানি করতেই তক্তাখানা ফস্ করে খুলে গেল, সেই ফাঁক দিয়ে নীচের পথ দেখতে পাওয়া গেল। লোকটি সেই ফাঁক দিয়ে তখনই নীচের পথে টুপ্ করে নেমে গেল। চারিদিক ঘেরা জেলের গাড়ীর ভিতরের অন্ধকারের

মধ্যে একটী কয়েদী যে এতো সহজে সরে পড়লো ও-পাশের এক কোণে বসে-থাকা পাহারওলাটী তার কিছুই টের পেল না।

আর্টিষ্ট রবিদত্ত পাশের এক রেস্তরাঁয় গিয়ে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অর্ডার করলো—রুটি আর মাংস—

আর্টিষ্ট নিশ্চিন্ত মনে রুটি আর মাংস খেতে স্থুরু করেছে, ইতিমধ্যে পথের ওপাশে জেলের বাসখানি ঘিরে গোলযোগ স্থুরু হোল। আর্টিষ্টের পাশে যে কয়েদীটী বসেছিল, রবিদত্ত বাহির হয়ে যাবার পরে সে যখন বাহির হবার চেষ্টা করছিল, সেই সময় বাহিরের পথের বৈদ্যুতিক আলোর যে অস্পষ্ট আভাষটুকু গাড়ীর ভিতরে এসে পড়েছিল, সেই আলোর আভাষে ভিতরে উপবিষ্ট একটা পুলিশের কেমন যেন সন্দেহ হয়। সে উঠে এসে লোকটিকে ধরে ফেলে। তখনই জানাজানি হয়ে যায় যে আরেকজন তার আগেই সরে পড়েছে।

পুলিশটী এসে জানালো—সা'ব, এক আদ্মী ভাগ্ গিয়া –

—ভাগ্ গিয়া!

ডেভিড ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল, তাড়াতাড়ি ছুটে এল। কোন্ পথ দিয়ে সরোজ পালিয়েছে দেখতে এসে বৈদ্যুতিক মশালের আলোয় ভাঙা তক্তাখানির পাশে একটুক্‌রো কাগজ সে কুড়িয়ে পেল, তাতে লেখা :

সরোজকে বন্দী করে চালান দেবার মত
জেলের গাড়ী আজও তৈরী হয়নি।

লেখাটী পড়ে ডেভিড রেগে আগুন হয়ে গেল। পাহারওলাটীকে বললো—তুম্‌কো খেয়াল নেহি থা? গাঁজা পিয়া?

—আঁধারমে কুছ্ ঠাহর নেহি হুয়া সা'ব।

—উয়ে বাৎ ম্যায় শুন্‌নে নেহি মাংতা, যাঁহাসে মিলে মেরে আদ্‌মি লাও—

জেল-ভ্যান্ ঘিরে কৌতূহলী জনতা মজা দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। হৈচৈ স্থুরু হোল।

—ছয়—

বাড়ী ফিরে ডেভিড সনিকে বললো—দেখ, তোমায় এখনি একটা কাজ করতে হবে।

—আমাকে?

দারোগা বাবু বললেন,—কি আছে দেখি ?

—গোটা দুয়েক ডিম, কিছু মোহনভোগ আর ক'খানা লুচি।

—দেখি, এদিকে নিয়ে এস—

দারোগা বাবু টিফিন-কেরিয়ারটী খুলে একবার দেখে নিলেন। চাকরটি মিথ্যা বলে নি, হালুয়া, লুচি এবং ডিম ছাড়া আর কিছুই নেই। একজন আর্দালীকে ডেকে বললেন—এই, লে যাও হাজতমে, আর্টিষ্ট বাবুকা পাশ—

আর্দালী টিফিন-কেরিয়ারটী রবি দত্তকে পৌছে দিয়ে এল।

খাবার পেয়ে আর্টিষ্ট সানন্দে খেতে বসে গেল। কয়েকখানা লুচি খাবার পর একখানা লুচি ছিঁড়তেই, তার ভিতর হ'তে একখানি কাগজ বাহির হোল।

কাগজখানি বাহির করে আর্টিষ্ট দেখলো—একখানি চিঠি। তখনই আর্টিষ্ট চিঠিখানি পড়ে ফেললো—তিনটী লাইন মাত্র চিঠিতে লেখা আছে :

সন্ধ্যাবেলার কালো বাস
সামনের দিকে ডাহিনের কোণ
চিলা তক্তার নীচেই পথ—

আর্টিষ্ট একবার পড়লো, দু'বার পড়লো, তিনবার পড়লো, একটু হাসলো। সহসা একটী আর্দালীর জুতার শব্দ পেয়ে চিঠিখানা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রেখে আবার খেতে সুরু করলো।

সেইদিনই আর্টিষ্ট রবি দত্তকে লালবাজারে চালান দেবার ব্যবস্থা হোল।

সন্ধ্যাবেলা লালবাজারের কালো রঙের চারিপাশ-ঢাকা প্রকাণ্ড বাসটী আর্টিষ্টকে তুলে নিয়ে যখন লালবাজারের দিকে আসছিল, পথে শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মোড়ে কয়েকখানি গরুর গাড়ী সামনে পড়ে যাওয়ায়, জেলের গাড়ীর চলা বন্ধ হয়ে গেল।

গাড়ীটী থেমে যেতেই ভিতরে একটী লোক উঠে দাঁড়ালো। এতক্ষণ সে যেন এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বসবার আসনের তক্তাখানা ধরে একটু টানাটানি করতেই তক্তাখানা ফস্ করে খুলে গেল, সেই ফাঁক দিয়ে নীচের পথ দেখতে পাওয়া গেল। লোকটি সেই ফাঁক দিয়ে তখনই নীচের পথে টুপ্ করে নেমে গেল। চারিদিক ঘেরা জেলের গাড়ীর ভিতরের অন্ধকারের

মধ্যে একটী কয়েদী যে এতো সহজে সরে পড়লো ও-পাশের এক কোণে বসে-থাকা পাহারওলাটী তার কিছুই টের পেল না।

আর্টিষ্ট রবিদত্ত পাশের এক রেস্তরাঁয় গিয়ে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অর্ডার করলো—রুটি আর মাংস—

আর্টিষ্ট নিশ্চিন্ত মনে রুটি আর মাংস খেতে সুরু করেছে, ইতিমধ্যে পথের ওপাশে জেলের বাসখানি ঘিরে গোলযোগ সুরু হোল। আর্টিষ্টের পাশে যে কয়েদীটী বসেছিল, রবিদত্ত বাহির হয়ে যাবার পরে সে যখন বাহির হবার চেষ্টা করছিল, সেই সময় বাহিরের পথের বৈদ্যুতিক আলোর যে অস্পষ্ট আভাষটুকু গাড়ীর ভিতরে এসে পড়েছিল, সেই আলোর আভাষে ভিতরে উপবিষ্ট একটা পুলিশের কেমন যেন সন্দেহ হয়। সে উঠে এসে লোকটিকে ধরে ফেলে। তখনই জানাজানি হয়ে যায় যে আরেকজন তার আগেই সরে পড়েছে।

পুলিশটী এসে জানালো—সা'ব, এক আদ্‌মী ভাগ্‌ গিয়া –

—ভাগ্‌ গিয়া !

ডেভিড ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল, তাড়াতাড়ি ছুটে এল। কোন্ পথ দিয়ে সরোজ পালিয়েছে দেখতে এসে বৈদ্যুতিক মশালের আলোয় ভাঙা তক্তাখানির পাশে একটুক্‌রো কাগজ সে কুড়িয়ে পেল, তাতে লেখা ঃ

সরোজকে বন্দী করে চালান দেবার মত
জেলের গাড়ী আজও তৈরী হয়নি।

লেখাটী পড়ে ডেভিড রেগে আগুন হয়ে গেল। পাহারওলাটীকে বললো—তুম্‌কো খেয়াল নেহি থা ? গাঁজা পিয়া ?

—আঁধারমে কুছ্‌ ঠাহর নেহি হুয়া সা'ব।

—উয়ে বাৎ ম্যায় শুন্‌নে নেহি মাংতা, যাঁহাসে মিলে মেরে আদ্‌মি লাও—

জেল-ভ্যান্‌ ঘিরে কৌতূহলী জনতা মজা দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। হৈচৈ সুরু হোল।

—ছয়—

বাড়ী ফিরে ডেভিড সনিকে বললো—দেখ, তোমায় এখনি একটা কাজ করতে হবে।

—আমাকে ?

—হ্যাঁ, তুমি ছাড়া সে কাজ আর কেউ করতে পারবে না। পুলিশের উপর আমার বিশ্বাস কম? তারা মাইনে-করা লোক, কাজ করে পয়সার খাতিরে। আর ক্ষতি হয়েছে আমাদের, আমরা কাজ করবো প্রাণের টানে। সেইজন্যই পুলিশের চেয়ে আমাদের সফল হবার সম্ভাবনা বেশী।

—বেশ, বলুন কি করতে হবে?

—এখনি তোমায় একবার বেরুতে হবে। শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মোড়ে সব কটি বাড়ীর ওপর তোমায় নজর রাখতে হবে। ওইখানেই কোন একটা হোটেলে কি বাড়ীতে সরোজ লুকিয়ে আছে বলে আমার বিশ্বাস। কখন্ কোন্ ফাঁকে সে সেখান থেকে সরে পড়বে। সেই সময়েই তাকে ধরতে হবে। তুমি ছাড়া সরোজকে চট্ করে আর কেউ চিনতে পারবে না, তাই তোমারই ওপর এই কাজের ভার দিচ্ছি। কাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত আমি এক মিনিট বিশ্রাম পাইনি, এখন একবার স্নান করে আমি খানিকক্ষণ জিরিয়ে নি, নাহলে আমি আর পারছি না—

—তার জন্য কি, আমি এখনি যাচ্ছি—এ তো সামান্য কাজ—

—এই তো তোমার ভুল, কাজটি মোটেই সামান্য নয়, শত্রুর সামনে যখন তুমি যাচ্ছ, তখন তোমার যথেষ্ট সাবধান হয়েই যাওয়া উচিত।

—সে আমি ঠিক থাকবো'খন—

—যত সহজে কথাটা বল্‌লে, কাজে অত সহজ নয়। এই বাঙালী জাতটা সব কাজেই 'ঠিক করছি', 'ঠিক করবো' করে, বেশী কাজই বে-ঠিক করে বসে। মনে রেখো যারা প্রিজ্‌নভ্যান্ থেকে পালাবার ব্যবস্থা করতে পারে, তাদের দলটা মোটেই সহজ নয়।

—বুঝেছি, বুঝেছি, আপনাকে আর অত করে সাবধান করে দিতে হবে না—বলে হাসতে হাসতে সনি বাহির হয়ে গেল।

শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মুখে একটা দোকানের সামনে লোক গিজ্‌গিজ্ করছে। ফুটপাতে চলাফেরা মুস্কিল হয়ে উঠেছে। লোকগুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেতারে গান শুনছে—

বেতারে তখন গান হচ্ছে:

—আমার দেশের মাটী
ও ভাই, সোণার চেয়েও খাঁটী

এই মায়েরই প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ করে ধন্য হতে
আসে কত জাতি।
ও ভাই, এই দেশেরই ধূলায় পড়ি
মানিক যায়রে গড়াগড়ি
ও ভাই, বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো
এই দেশেরই জীবন কাঠি।
এই মাটী, এই কাদা মেখে
এই দেশেরই আচার দেখে
ও ভাই, সভ্য হোল নিখিল ভুবন
দিব্য পরিপাটি।
—আমার দেশের মাটি—

সনি সেইখানেই দাঁড়ালো কতকক্ষণ, যেন কতই গান শুনছে, কিন্তু আসলে তার দৃষ্টি ঘুরছিল চারিপাশে। চারিদিকের বাড়ী ও দোকানগুলি সে চঞ্চল দৃষ্টিতে বারবার তন্নতন্ন করে দেখেছিল। কানের পাশে যে বেতারের সুর ঝঙ্কার তুলে চলেছে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই। রোগীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নার্স যেমন স্থিরভাবে প্রলাপ শুনে যায়, কোন কথাই কাণের ভিতর দিয়ে তার মনকে স্পর্শ করতে পারে না, সনিও যেন তেমনি ভাবেই বেতারের প্রলাপ শুনছিল।

সহসা গানের কয়েকটি লাইন তার কানে এসে লাগলো ঃ

এই মাটি, এই কাদা মেখে
এই দেশেরই আচার দেখে
ও ভাই, সভ্য হোল নিখিল ভুবন
দিব্য পরিপাটী—
—আমার দেশের মাটী—

সনি ধীরভাবে শুনলো। খানিকক্ষণ সে সরোজের কথা, বিনয়বাবুর কথা, সব ভুলে গেল। গানের প্রত্যেকটী লাইন তাকে মুগ্ধ করলো। এমন গান সে কখনও শোনেনি, ইংরাজি ভাষায় যে এমন একটীও গান আছে তা তো কই আজ পর্যন্ত তার চোখে পড়ে নি।

গানের কথা ভাবতে ভাবতে বাঙালী জাতির উপর সনির অনুকম্পা হোল। এই জাতিটী শত অসুবিধা শত বাধা ঠেলে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনে আজও মাথা তুলে সকল সভ্যজাতির সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলেছে। এত দুঃখ ও দারিদ্র্য না থাকলে বাঙালীর সাধনায় হিন্দু সভ্যতা আজ হয়তো জগতের সকল জাতিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেত!

সহসা পাশের একটী বাড়ী হতে বাহিব হয়ে একটী লোক গট্‌গট্‌ করে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। লোকটীর মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই সনি চমকে উঠলো—সে মুখ সরোজের!

সরোজ! সনির শরীরে যেন ইলেক্‌ট্রিকের শক্‌ লাগলো, সেই মুহূর্তেই সে সরোজের পিছু নিল।

তারপর সুরু হল লুকোচুরী খেলা—

সরোজ বোধ হয় টের পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক করে কতবার পথের ভীড়ে সে মিশে যাবার চেষ্টা করলো, সরু গলির এ-মুখ দিয়ে ঢুকে অন্যমুখ দিয়ে বাহির হয়ে গেল, এ ফুটপাত থেকে ও দিকের ফুটপাতে গেল, কিন্তু কিছুতেই যখন সনির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলো না, তখন একখানি ছুটন্ত বাস দেখতে পেয়ে সে ছুটে গেল বাস ধরার জন্য।

তাড়াতাড়ি বাসখানি ধরতে গিয়ে সরোজ কোন দিকে চাহে নাই। বামের এ পাশ দিয়ে সমান্তরালে একখানি মোটর ছুটে আসছিল, বাস ধরতে গিয়ে সরোজ সেই মোটরখানির সামনে গিয়ে পড়লো। তখনই ব্রেক কষলেও বেগবান যান্ত্রিক চাকা কয়েক পাক ঘুরে কয়েক ফুট এগিয়ে গেল - সরোজকে ধাক্কা মেরে মোটরখানি থামলো। ধাক্কা খেয়ে বেচারা ছিট্‌কে পড়লো, পড়েই অজ্ঞান।

মহানগরীর রাজপথ। দেখতে দেখতে ভীড় জমে গেল।

জনতার মধ্যে একটী লোক সরোজকে দেখে চমকে উঠলো, বললো—ইস্‌, এ যে আমার বন্ধু—

সকলের দৃষ্টি তার উপর গিয়ে পড়লো।

ভীড়ের মধ্যে পথ করে নিয়ে লোকটী সরোজের পাশে এসে দাঁড়ালো, বললো—বিশেষ কোথাও চোট লেগেছে নাকি?

- না না, ধাক্কা লেগে ছিট্‌কে পড়েছেন—ভীড়ের মধ্যে থেকে অনেকে একসঙ্গে জবাব দিল—ওই যে মোটর···

মোটরখানি দাঁড়িয়েছিল, লোকটী তার নম্বর টুকে নিল। তারপর বললো—আপনারা কেউ দয়া করে আমায় একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন, হাসপাতালে নিয়ে যাব—

চারিপাশের জনতা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ট্যাক্সি করে, তার মধ্যে সরোজকে তুলে নিয়ে মোটর ছেড়ে দিতে বোধ হয় একমিনিটও লাগলো না।

সনি তখন ভীড়ের বাহিরে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সনির মুখে সব শুনে ডেভিড তখনই ফোন ধরলো—ক্যাল্‌কাটা মেডিক্যাল কলেজ—

—ইয়েস্।

—শ্যামবাজারের মোড়ে একটু আগেই যে একটা মোটর এক্‌সিডেণ্ট হয়েছে, সেখান থেকে ওখানে কেউ ভর্তি হয়েছে ?

—না।

—আপনি ঠিক জানেন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানবো নাতো আর কে জানবে বলুন! তবে আপনি কারমাইকেলে একবার খোঁজ করে দেখুন; আমি এখান থেকেই কনেক্‌শন করে দিচ্ছি—

কারমাইকেল হাসপাতাল থেকেও সেই একই কথা এবং সেই একই উত্তর।

টেলিফোন ছেড়ে ডেভিড্ হতাশ ভাবে চেয়ারে বসে পড়লো, বললো—যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই– হাসপাতালের ধাপ্‌পা দিয়ে দলের কোন লোক তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

—তাতে তাদের লাভ ?

—লাভ কিছু নেই, তবে লোকসান থেকে বেঁচে গেল। হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাছাড়া পুলিশের নজরে পড়ারও ভয় আছে—

– কিন্তু মোটরের ধাক্কা লেগে সরোজদা যে অজ্ঞান হয়ে গেল তার চিকিৎসার কি হবে ?

—কেন, হাসপাতাল ছাড়া কি চিকিৎসা হয় না ?

ব্যাপারটা আলোচনা করে ডেভিড ও সনির মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো।

—সাত—

ধীরে ধীরে সরোজ চোখ মেললো।

একখানি সাজানো-গোছানো সাধারণ ঘর। দেয়ালে ক'খানা পুরাণো ছবি টাঙ্গানো। ছবিগুলি নামকরা বিদেশী চিত্রকরদের বিখ্যাত ছবির নকল। ঘরের ওদিকের কোণে একটি লম্বা টিপয়ের উপর একটী ফুলদানি, তাতে কয়েকটী সূর্যমুখী ফুল এমন ভাবে সাজানো রয়েছে, যে সহসা দেখলে কাগজের ফুল বলে মনেই হয় না—এই ফুলগুলির পানে চেয়েই সরোজ প্রথম চোখ মেললো।

চোখ মেলেই সরোজ তাড়াতাড়ি চোখ বুঁজলো। জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে ফুলগুলির উপর পড়েছে। তীব্র রঙীন কাগজের দলগুলির উপর রৌদ্র প্রতিফলিত হয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই সরোজের চোখ ঝল্সে উঠলো। যেমন সহসা সে চোখ খুলেছিল তেমনই সহসা সে চোখ বুঁজলো।

ক' সেকেণ্ড পরে আবার সরোজ চোখ চাইল।

ক্রমশঃ সেই রোদের তীব্রতা সরোজের চোখে সহ্য হয়ে গেল। সরোজ বিছানার উপর উঠে বসলো। সামনের খোলা জানালা দিয়ে বাহিরের পানে চাইল; শুধু গাছের সারি, সবুজ পাতার পর পাতা। সেই ঘন পাতা আর ডাল-পালার ভীড়ের ফাঁকে চক্‌চকে খানিকটা জলও চোখে পড়ে, তার বেশী আর দৃষ্টি চলে না।

সরোজ খাট হতে নাবলো। মাটীতে পা দেওয়ামাত্র তার মাথা ঘুরে গেল। খাটের একটা বাজু ধরে নিজেকে সামলে নিল। তারপর মাথাটা অত্যন্ত ভারবোধ হওয়ায় হাত দিয়ে দেখে প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

ব্যাণ্ডেজ!···ব্যাণ্ডেজ কেন? কি হয়েছে?

সরোজ ধীরে ধীরে দরজার দিকে গেল। দরজা বাহির থেকে বন্ধ। সরোজ দুম্ দুম্ করে দরজায় দুটো চাপড় মারলো। সেই দুটো চাপড় মারার পরিশ্রমে তখনই তার মাথার মধ্যে চন্ চন্ করে উঠলো। তাড়াতাড়ি কোন রকমে ফিরে এসে সে বিছানার উপর বসে পড়লো।

একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ হোল।

দরজা খুলে যিনি ভিতরে এলেন সরোজ তাকে কোন দিন দেখেনি।

লোকটী ঘরে ঢুকেই হেসে জিজ্ঞাসা করলো—আমায় ডাকছিলেন কেন? এখন কেমন আছেন? মাথায় কোন যাতনা নেই তো?

—যাতনা ? —না, যাতনা কিছুই নেই, কিন্তু আমার মাথায় কি হয়েছে বলুন তো ?

—কেন আপনার কিছু মনে পড়ে না ?

—না।

—সে অনেক কথা বলবো এখন পরে, এখন আপনি বড় দুর্বল—

—তা হোক্ আপনি বলুন, আমি এত দুর্বল এখনও হইনি যে, আপনার কথা শুনে হার্টফেল্ করবে।

—না হার্টফেল করার কথা নয়, অন্য কারণও আছে।

—কি কারণটা বলুনই-না শুনি ?

—নেহাৎ যখন শুনতে চান, তখন বলি।—আপনার দাদা আপনাকে এখানে রাখার ব্যবস্থা করেছেন, তিনিই বারণ করে দিয়েছেন কোন কথা বলতে—

—আমার দাদা !

সরোজ বিস্মিত হোল। তার দাদা যে কেউ আছে তা সে কোন দিন জানে না। এই লোকটা কাকে তার দাদা বলছে, সে কিছুই বুঝতে পারলো না।

লোকটা হাসলো, হেসে বললো—হ্যাঁ, আপনার দাদা বিনয় রায়।

লোকটা হাসে চমৎকার! হাসতে হাসতে পিঠের কুঁজটা দুলে দুলে ওঠে, সারা দেহের বাহার খুলে যায়, বলে—আপনার দাদাকে আপনি চেনেন না ? হি হি হিঃ !

সরোজের মনে হোল লোকটার গালে ঠাস্ করে এক চড় মেরে তার ওই কদাকার দাঁতগুলি সব ভেঙে দেয়। কিন্তু মনে যা ভাবা যায়, সব সময় কাজে তা করা উচিৎ নয় বলেই সরোজ তখনকার মত সংযত হয়ে বললো—না, আমার দাদাকে আমি চিনি না। তিনি কে ? কেন আমাকে এখানে এনে রেখেছেন ?

—তিনি একজন ডাক্তার, এটা তাঁর বাগানবাড়ী, জায়গার নামটা আপনাকে বলতে বারণ করে দিয়েছেন।

—তার মানে ? আমায় তাহলে এখানে 'গুম্' করে রাখা হয়েছে ?

আজ্ঞে, ঠিক তা নয়, আপনার ভালর জন্যই এখানে কিছুদিন আপনার লুকিয়ে থাকা দরকার বলেই তিনি এখানে আপনাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

—কেন, বলুন তো ?

—সেটা আমি ঠিক জানি না, বড়বাবু সে কথা তো আমায় কিছু বলেন নি। থাক্, আমি এখন যাই, আপনার কোন দরকার হলেই আমায় ডাকবেন, —বলে লোকটী বাহির হয়ে গেল, যাবার সময় দরজাটা বাহির হতে শিকল তুলে বন্ধ করে যেতে ভুললো না।

সরোজের মাথায় তখন চিন্তার ঝড় উঠেছে, তার দাদা এই বিনয় রায় লোকটী কে? এমনি ভাবে তাকে আট্‌কে রাখার উদ্দেশ্য কি? সরোজের দাদা হবারই বা তার এত সখ্ কেন?

ভেবে ভেবে কোন কথারই জবাব মিললো না।

—আট—

বন্দী পাখী।

খাঁচার অল্প পরিধির মধ্যে ছট্‌ফট্ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অসীম আকাশের নীলিমা, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ, শ্যামল বনানীর মায়া, বন্দী পাখীর মনকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, মুক্তির সন্ধানে উদাসদৃষ্টি মেলে খাঁচার দারজার পানে পাখী তাকিয়ে থাকে—যদি দৈবাৎ খাঁচার দরজাটী একবার খুলে যায়, তা হলে ওই আকাশের বুকে, মাঠের শেষে, বনানীর মাথার উপর দিয়ে পাখা মেলে সে একবার নিরুদ্দেশের পথে বাহির হয়ে পড়ে। মানুষের মিষ্টি ব্যবহার, ভাল খাবারের লোভ কিছুই আর বন্দী পাখীর মনকে পিছনের পানে ধরে রাখতে পারে না। তা না পারলেও, খাঁচার দরজাটী দৈবাৎ খোলা পাবার সৌভাগ্য সকল পাখীর জীবনে আসে না।

সরোজের অবস্থাও এই খাঁচার পাখীর মত।

বাড়ীর এই দেয়ালের বেষ্টনী পার হয়ে পথে বাহির হবার আকাঙ্ক্ষায় মন উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু সতর্ক প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে কোন দিন সে নীচের তলায় নাবতে পারে নি, তা বাড়ীর বাহির হওয়া তো অনেক দূরের কথা।

বন্দী সরোজের ঘরের মধ্যে দিন কাটে, রাত্রি কাটে। ঘরের সাম্‌নে একটী কোকিল মাঝে মাঝে একটানা চীৎকার করে ডাকতে থাকে—কু-উ! কু-উ!! কুউ-উ!!! পোষ-মানানো বন-ছাড়া বন্দী কোকিলের সে কান্না সরোজের মনকেও বিষন্ন করে তোলে। শুয়ে শুয়ে ভাবে কি করে মুক্তি মিলবে? এই বন্দীনিবাসের সন্ধান ডেভিড্, বিনয়বাবু ও সনি কি করেই বা জানবে?

সহসা সেদিন কোকিলের ডাক শুনে একটী কথা সরোজের মনে পড়লো: যুদ্ধক্ষেত্রের কথা। পোষা পায়রার পায় ছোট ছোট চিঠি বেঁধে সৈনিকেরা ছেড়ে দিয়েছে! শত বন্দুকের গুলিকে ফাঁকি দিয়ে পায়রা ঠিক চিঠি এনে দিয়েছে যেখানে খবর পাঠানো দরকার। কিন্তু এ তো তেমন পায়রা নয়, এ যে কোকিল! তা হোক, পাখী তো বটে!

সেই দিন হতে সরোজ কোকিলটীকে আদর করতে সুরু করলো। যখন-তখন খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, যা পায় আদর করে পাখীটীকে খেতে দেয়। কুঁজো লোকটী দেখে, মুখে কিছুই বলে না, আড়ালে উপহাস করে মুখ ভ্যাংচায়।

একদিন কুঁজোকে সরোজ বললো—দাদা আমায় আটকে রেখেছেন, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোন কথা বলেছেন কি?

—কেন, কি খাবেন বলুন?

—ভাল বিস্কুট খাওয়াতে পার, আর চা?

—নিশ্চয়ই। আজই আমি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে চা-বিস্কুট আনাবার ব্যবস্থা করছি।

—তবেই আমি খেয়েছি!

—তার মানে? আজ বিকালেই যদি আমি আপনাকে চা-বিস্কুট না খাওয়াতে পারি, তো কি বলেছি!

সত্যই সেদিন বিকালে এক টিন বিস্কুট এনে সে সরোজের হাতে দিল! চা-ও সে এনেছিল। সরোজ এ-ই চাইছিল। তখনই চায়ের আয়োজন করতে বসলো। বিস্কুটের টিন খুললো। চা বিস্কুটের দস্তুরমত ভোজ লেগে গেল। সরোজের মুখে হাসি ফুটলো।

সরোজের মুখে হাসি ফুটলো চা-বিস্কুট খেয়ে নয়, বিস্কুটের টিনের মধ্যে কাগজ পেয়ে। পেন্সিল কি কলম দিয়ে তো সে-কাগজে লেখা যায় না, আর পেন্সিল ও কলম সরোজের কাছে ছিলও না। আগে থেকে একটী আল্‌পিন্ সে যোগাড় করে রেখেছিল। পরদিন দুপুরে অবসর বুঝে বিস্কুটের টিনের একটুক্‌রো সাদা কাগজে আল্‌পিন্ দিয়ে সারি সারি ছিদ্র করতে বসলো।

কতকক্ষণ বাদে কাগজের টুক্‌রোটি চোখের সামনে আলোয় তুলে ধরতেই দেখা গেল সারি সারি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে কতকগুলি অক্ষর দেখা যাচ্ছে—কয়েক লাইন ইংরাজীতে লেখা:

Please have pity for an unfortunate man to send this news to Surgeant David, Lalbazar, Calcutta. I am a prisoner in a two-storied red-brick house surrounded by a garden and a wall. A pond just outside the wall. Do not know in what part of the country I am.—Saroj.

[হতভাগ্য পত্রলেখকের প্রতি দয়া করে এই চিঠিখানি কলিকাতার লালবাজারের সার্জেন্ট ডেভিডের কাছে পৌঁছে দেবেন। আমি প্রাচীরবেষ্টিত একটি দোতলা বাগান বাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়ে আছি। লালরঙের ইঁট-বাহির-করা বাড়ী। প্রাচীরের বাইরেই একটি পুকুর দেখতে পাওয়া যায়। কোথায়, কোন অঞ্চলে রয়েছি,—কিছুই জানি না। ইতি—সরোজ।]

চিঠিখানি সরোজ ইংরাজীতেই লিখলো, কেননা অবাঙ্গালীর হাতে পড়লেও মারা যাবে না।

লেখা শেষ করে কাগজখানিকে ভাঁজ করে সরোজ যতটা পারলো ছোট করে ফেল্লো, তারপর কাপড়ের খুঁট থেকে কয়েকটা সূতা দিয়ে চিঠিখানি বেঁধে পকেটে রাখলো।



সেই দিন থেকে পাখীটাকে আদর করার ছলে সরোজ শুধু সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো।

একদিন সুবিধা পেয়ে খাঁচা খুলে কোকিলটাকে বাহির করে সরোজ সেটাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। তারপর তার এক পায়ে চিঠিখানি বেঁধে জানালা দিয়ে পাখীটাকে উড়িয়ে দিল। শৃঙ্খলিত পাখী সহসা মুক্তি পেয়ে আনন্দের উল্লাসে সুনীল আকাশের বুকে ডানা মেলে কোথায় উড়ে গেল, পায়ে-বাঁধা চিঠির অস্বস্তি সে ভুলে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় সরোজ চেয়ে রইল ঃ সেই কালো কোকিলটা দুপুরের নীল আকাশের কোলে মিলিয়ে গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সরোজ জানালার কাছ হতে ফিরে এসে নিজের বিছানার উপর বসে পড়লো। ওই পাখীটার মত কবে সে মুক্তি পাবে কে জানে!

—নয়—

কলিকাতা হতে কয়েকমাইল দূরে বরাহনগরের এক নির্জন পল্লীতে একটা বাগানের এক গাছের গুঁড়ির উপর হেলান দিয়ে একটি যুবক গঙ্গার পানে তাকিয়ে বসেছিল। যুবকটী বসে বসে গঙ্গার পানে চেয়ে শিস্ দিচ্ছিল···ফিফিফি, ফিফিফি —ফিফি—

তার শিস্ দেওয়ার সঙ্গে তাল রেখে নদীর জলও যেন তটে এসে ঘা খাচ্ছিল —ছল্-ছল্, ছলাৎ-ছল্—

যুবকটী বসে বসে দেখতে থাকে, নদীর জল যেখানে ওপাশের বড় বড় গাছ গুলির কাছে গিয়ে মিশেছে। গাছ-গুলির আশেপাশে মাঝে মাঝে এক একখানি ছোট-বড় বাড়ী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে একপাশে কারখানার চিমনীর ধোঁয়ায় নীল আকাশের খানিকটা ঢাকা পড়ে গেছে। তার পিছনে নীল আকাশ কোথায় মাটীর কোলে মিশিছে তা আর চোখেই পড়ে না। চোখে পড়ে চিক্‌মিকে নদীর জল রোদের আলোয় নেচে উঠেছে। বাতাসে পাল ফুলিয়ে হেলে-দুলে ছবির মত নৌকাগুলি ভেসে চলেছে। একখানি সজীব ছবি যেন। বসে বসে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে। সহরের গোলযোগ, মোটরের হর্ণ, গরুর গাড়ীর চাকার কচ্ কচ্ শব্দ, দমকলের ঘণ্টা, এখানকার বাতাস কাঁপায় না, মনকে চকিত করে তোলে না, এখানকার শান্তি মনের উপর যেন স্নেহের পরশ দেয়। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে কখন যুবকটীর শিস্ থেমে গেছে, সহসা তার কণ্ঠ খুলে গেল, সে গান ধরল—

সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে
মাগো, আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে
নয়ন মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
সেই আলোতে নয়ন রেখে মুদবো অবশেষে
সার্থক জনম মাগো, জন্মেছি এই দেশে—

ছেলেটী গাইতে জানে।

কিন্তু বেশীক্ষণ তার গান গাওয়া চললো না। সহসা মাথার উপরে গাছের শাখা হতে সূতায় বাঁধা একটুকরা কাগজ তার সামনে এসে পড়লো। সূতা-জড়ানো কাগজ, কৌতূহলী হয়ে ছেলেটী তা তুলে নিল। সূতা খুলে দেখলো, একটুকরো সাদা তৈলাক্ত কাগজে অসংখ্য ফুটো, ফুটোগুলি দূর হতে কেমন-যেন অক্ষর বলে মনে হয়। ছেলেটী কাগজখানি চোখের সাম্‌নে আলোয় ধরলো,—ফুটোগুলির ভিতর দিয়ে আলো এসে সত্যই কতকগুলি অক্ষর ফুটে উঠলো। একটির পর একটি অক্ষর পড়ে ছেলেটি সবটা পড়ে ফেললো—

Please have pity for an unfortunate man to send this news to Surgeant David, Lalbazar, Calcutta. I am a prisoner in a two-storied, red-brick house surrounded by a garden and a wall. A pond just outside the wall. Do not know in what part of the country I am.—Saroj

একবার পড়লো, তু'বার পড়লো। ভাল করে, তিনবার পড়ে যুবকটি কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো, তারপর আন্‌মনা ভাবে উঠে পথ চলতে সুরু করলো। মুখে আবার তার শিসের রেশ—ফিফিফি—ফিফি—ফি—!

খানিকটা পথ এসে সে থামলো। সেখানে তু'পাশের ক্ষেতের সীমা শেষ হয়ে এক একখানি বাড়ী মাথা তুলেছে। পর পর ক'খানি বাড়ী পার হয়ে একটি বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। সাম্‌নের বড় একটি পুকুরের উপর বাড়ীখানি ছবির মত দেখাচ্ছে। বাড়ীটির পানে তাকালে কেউ সেই বাড়ীতে বাস করে বলে মনেই হয় না, জানালা দরজা সব বন্ধ। সারা বাড়ীখানি ঘিরে কেমন যেন একটা জনহীন থম্‌থমে ভাব।

বাড়ীখানির পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে যুবকের মুখে হাসি খেলে গেল। বাড়ীর ফটকের সামনে গিয়ে সজোরে কড়া নাড়তে সুরু করে দিল।

অনেকক্ষণ কড়া নেড়েও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

—জানি সাড়া পাওয়া যাবে না—নিজের মনেই কথাগুলি বলে কড়ার উপর পা দিয়ে সে ফটকের উপর উঠে দাঁড়ালো, তারপর ভিতরে কেউ নেই দেখে পাকা ব্যায়ামীর কায়দায় ফটক ডিঙিয়ে ভিতরে লাফিয়ে পড়লো।

ভিতরে বাগান পার হয়ে বরাবর বাড়ীর দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলো—কে আছেন ?

জনহীন ঘুমন্ত পুরীর দরজা সহসা ভিতর হতে খুলে গেল। যে লোকটি দরজা খুলে বাহিরে এল, সরোজের মুখের পানে তাকিয়ে সে খানিকক্ষণ থ' হয়ে গেল।

তার ভাব দেখে যুবকটী হেসে, বললো—চিনতে পেরেছ তাহলে ?

—আ…হ্যাঁ…তুমি…আপনি…—ঠিক করে গুছিয়ে কথা বলতে লোকটীর খানিকক্ষণ সময় লাগলো।

যুবক বললো—হ্যাঁ, আমিই! আর্টিষ্ট রবি দত্ত—তাই না ?

—আঁ…হ্যাঁ…

—বলি, সরোজকে এখানে কদ্দিন আট্‌কে রাখা হয়েছে ?

—অ্যাঁ, সরোজ, সরোজ কে ?

—আমায় লুকোবার চেষ্টা মিছে, আমি সব জানি—এখনি পুলিশ নিয়ে আসবো—

—পুলিশ, আমার বাড়ীতে আপনি পুলিশ নিয়ে আসবেন, ভদ্রলোকের বাড়ীতে……

—আরে তুমি আবার ভদ্রলোক হলে কবে হে ?—রবির মুখে হাসি খেলে গেল।

—কি, কী! ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকে অপমান, বেরিয়ে যাও,—শীগ্‌গীর বেরিয়ে যাও—বলতে বলতে লোকটী এমনভাবে রবিকে তাড়া করে এল যে সেখানে একা দাঁড়িয়ে থাকা আর বুদ্ধিমানের কাজ হবে না দেখে যুবকটী আত্মরক্ষা করার জন্য পিছিয়ে এল।

লোকটী চীৎকার করে উঠলো—ফের যদি তোমায় এই বাড়ীর সীমানার মধ্যে দেখি, তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন, দেখে নেব—

—তোমার ডাক্তার সর্দারই কিছুই করতে পারবে না, তা তুমি! তোমাদের সর্দারকে বলো যে, সয়তানকে শায়েস্তা করতে আর্টিষ্ট রবি দত্ত জানে, বুঝলে?

যাহার উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলা হোল সে ততক্ষণে হাতে একখানি ইঁট তুলে নিয়েছে।

—এই যে বোঝাচ্ছি—বলে হাতের ইঁটখানি সে রবির দিকে ছুঁড়ে মারলো।

ইঁটখানি এসে গায়ে লাগবার আগেই রবি সাবধান হয়েছিল। ছুটে এসে ফটক পার হয়ে একেবারে বাহিরের পথে এসে দাঁড়ালো।

লোকটা কিন্তু ফটক খুলে আর বাহিরে এল না, ফটকের ভিতর হতে চীৎকার শোনা গেল—ফের ভিতরে এলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব—

রবি একটু হাসলো, মুখে কিছুই বললো না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পথের ওদিকে একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লো।

গাছের আড়াল হতে রবি চোখ রেখেছিল বাড়ীটার পানে।—

অনেকক্ষণ বাদে কোন-এক-সময় যে লোকটা তাকে দূর দূর করে তাড়িয়েছিল সে ফটক খুলে বাহির হয়ে এল। ধোপ-দোস্ত পোযাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় কোথায় যেন যাচ্ছে। রবি এতক্ষণ এইরূপই একটা-কিছুর প্রতীক্ষা করছিল। সে-ও উঠে দাঁড়ালো। লোকটা ফটকে একটা বড় তালা লাগিয়ে পথে অগ্রসর হোল। রবিও একটু তফাতে থেকে তার পিছু নিল।

লোকটা হাঁটতে পারে বেশ! তার পিছু-পিছু চলতে চলতে রবির পায়ে ব্যথা ধরে গেল, তবু লোকটার হাঁটার বিরাম নেই। বাসে কি গাড়ীতে একটী পয়সা দেবে না, মাইলের পর মাইল হেঁটেই চললো।

রবিও ছাড়বার পাত্র নয়।

হেঁটে সব পথ শেষ করে, শেষে শ্যামবাজারের মোড়ে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে এসে ঢুকলো। বাড়ীর দরজায় পালিশকরা পিতলের ফলকের উপর একটা নাম ঝক্‌মক্ করছিল: ডক্‌টর বি. রায় এম-বি, ডি-টি-এম

নামটা পড়ে রবিদত্তের মুখে হাসি ফুটলো।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে কি ভাবলো, তারপর সেই বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো।

ডাক্তার বিনয় রায় এম্-বি, ডি-টি-এম্।

দোতলার ঘরে আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু 'টাই' বাঁধছিলেন, একটা লোক তার পিছনে এসে দাঁড়ালো, বললো,—গুড্ মর্নিং, ডক্টর!

ডাক্তারবাবু চমকে উঠলেন, মুখ ফিরিয়ে আগন্তুকের মুখের পানে তাকালেন, লোকটিকে চিনলেন, তার মুখে একটা বিরক্তির ছায়া ফুটে উঠলো, ভ্রূ দু'টী কুঁচকে তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কি? তোমার কি চাই?

লোকটী হাসলো, বললো—কি চাই?—এ জগতে সব চেয়ে যা বেশী দরকার; টাকা চাই,—টাকা!

—টাকা?

—হ্যাঁ, টাকা—বলে আগন্তুক হেসে সুর করে বললো—

Money, money, money!
চায় সকল প্রাণী—
Brighter than sunshine,
Sweeter than honey!

ডাক্তার এবার রুক্ষ স্বরে বলে উঠলো—তুমি কি মনে কর তোমার জন্য আমি টাকার থলে নিয়ে বসে আছি, তুমি এসে বলবে টাকা চাই আর আমি তোমায় টাকা দোব?

—কেন দেবেন না! আপনার সব কথা আমি যদি পুলিশে জানাই, তাহলে আপনার অবস্থাটা কি হবে জানেন তো?

—হ্যাঁ, তা আমি জানি, আর জানি বলেই তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে তোমার ধাপ্পাবাজীতে আমি ভুলবো না, টাকা তো আমি বিলোতে বসিনি।

—শুধু কথাই নয়, আমি প্রমাণ করবো, প্রমাণ আমার হাতেই আছে।

—বেশ, প্রমাণ কর।

—প্রমাণ তো করবই। সরোজকে বোধ হয় আপনি এত শীগ্‌গির ভুলে যান নি! সেই সরোজ,—যাকে আপনি হিপ্‌নোটাইজ্ করে আর্টিষ্ট রবি দত্ত সাজিয়েছিলেন।

সরোজের নাম শুনে ডাক্তারের মুখ কালো হয়ে গেল। সহসা যেন কেউ তার

মুখের উপর কয়েক ঘা চাবুক মারলো। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত স্বরে বললেন—তোমার ওসব বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই। কে সরোজ আমি চিনি না।

—এখন আপনি তাকে চিনবেন না, তা আমি জানি। কিন্তু যখন তাকে হিপ্‌নোটাইজ্‌ করে চল্লিশ হাজার টাকা ডাকাতি করিয়েছিলেন, তখন নিশ্চয়ই সরোজকে চিনতেন।

এই কথার পর নিজেকে সামলে রাখা ডাক্তারের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়লো, গলা চড়িয়ে বললেন—বেশ করেছি ডাকাতি করিয়েছি, তাতে তোমার কি? তোমায় আমি আর এক পয়সা দোব না। যাও, পুলিশে গিয়ে বলগে ওই সব কথা।

—শুধু বলাই নয়, প্রমাণও করবো। সরোজ এখন কোথায় আছে জানেন?—আমারই মুঠোর মধ্যে। জেলের গাড়ী থেকে পালাবার পর সরোজের আর কোন খবর আপনি জানেন? ওই সরোজকে দিয়েই আমি অনেক কিছু প্রমাণ করবো। হয় টাকা দিন, নাহলে আপনার ডাক্তারীর মুখোস আমি খুলে দোব।

—টাকা?—তোমায় আমি আর এক পয়সা দোব না, ফের যদি তুমি কখনো আমার কাছে টাকা চাইতে আস, তাহলে তোমায় আমি কুকুরের মত গুলি করে মারবো।

—কিন্তু আমি তো আর কুকুর নই, কুকুরকে মারলে ফাঁসী হয় না, কিন্তু আমায় মারলে আপনাকে ফাঁসীতে ঝুল্‌তে হবে।

রহমৎ স্বচ্ছন্দে কথা বলে যাচ্ছিল, তাকে গুলি করবার ভয় দেখিয়েও যখন ডাক্তার তাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারলো না, তখন সহসা সুর নামিয়ে বললো—দেখ রহমৎ, তোমার সঙ্গে আমি একটা বোঝাপাড়া করে ফেল্‌তে চাই। তুমি রোজ এসে টাকা চাইবে, আর আমি টাকা দোব, এ কখনো হতে পারে না। তোমায় আমি একেবারে যা-হোক কিছু টাকা দিয়ে একটা লেখা-পড়া করে নিতে চাই, তাতে তুমি রাজী আছ?

—নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনি কত টাকা দেবেন?

—পাঁচশো।

—অতো কমে হবে না। পাঁচটা হাজারের নীচে আমি নোব না।

—কিন্তু আমি তোমায় কোনোদিন পাঁচ হাজার টাকা দোব না এ তুমি বেশ জানো!

—তবে কত দেবেন ?

—বড় জোর এক হাজার।

—না, অত কম আমি নোব না, একটা মাঝামাঝি রফা করুন।

—বেশ দু'হাজার !

—কিন্তু…

—না, এর উপর আর কোন কথা নেই। এখনই কোন বাইরের অচেনা-অজানা রোগী এসে পড়বে, যদি দু' হাজার টাকা নিতে রাজী থাক তো ভেতরে চলো—

ডাক্তার উঠলেন।

রহমৎও উঠলো।

বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে ডাক্তার বললো—দেখ, তোমার হাতে সরোজ আছে, তা আমি জানি; তোমায় আমি সেইজন্যই টাকা দিচ্ছি। আজ এখন তোমায় দেব হাজার, আর সরোজকে আমার বাড়ীতে পৌছে দেবার পরে তুমি পাবে বাকী এক হাজার।

—অতো কমে আপনি কাজ হাসিল করতে চান ?

—দেখো, ওর বেশী আমি তোমায় একপয়সা দোব না। ইচ্ছা হয় ওই নিয়ে সরোজকে আমার কাছে দিয়ে যাও, তা যদি না পার তো চলে যাও, আমি তোমায় এক পয়সাও দোব না।

—তা আপনি যখন বলছেন।

ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সে হাসি রহমতের চোখে পড়লে তার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠতো।

আর কোন কথা হোল না। কয়েকটী ঘর পার হয়ে ডাক্তার একটী ঘরে এসে ঢুকলো, একটি চেয়ার দেখিয়ে রহমৎকে বললো—বসো—

রহমৎ বসলো।

রহমতের চেয়ারের সামনে একটী টেবিল। টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বললো—দেখ রহমৎ, তোমায় আমি এখনি হাজার টাকা দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমায় বলতে হবে আর্টিষ্ট রবি দত্ত কোথায় আছে ?

—আর্টিষ্ট রবিদত্ত তো নয়, সে সরোজ।

—সরোজের কথা নয়, আমি আসল আর্টিষ্ট রবিদত্তের কথাই জিজ্ঞেস করছি।

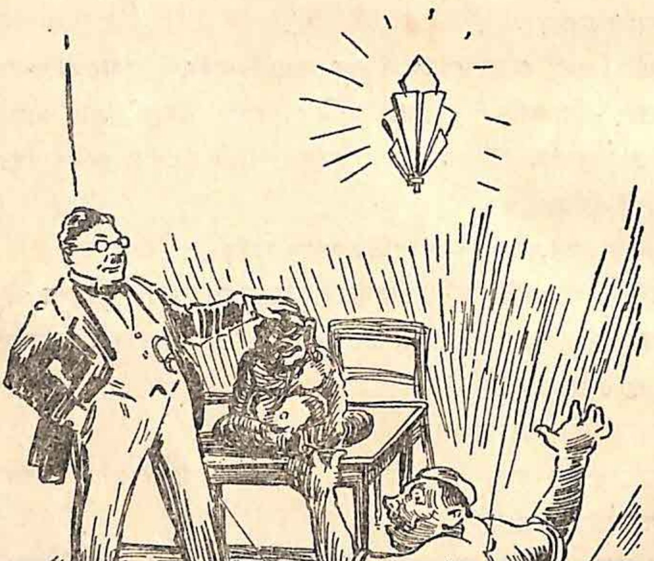
—তার খবর তো আমি জানি না।

—নিশ্চয়ই জানো। তোমরা দু'জনে এক দিনে একসঙ্গে আমার বাগান-বাড়ী থেকে সরে পড়। তোমাদের দু'জনে ভারী ভাব, আর তুমি তার খবর জানো না ?

—বেশ, জানি তো জানি। কিন্তু আমি যা জানি তাই আপনাকে বলতে হবে, এমন তো কোন কথা নেই। আর রবি দত্তের কথা শুনে আপনার লাভ কি ?

—লাভ আমার আছে, আমি তার ভাই···

—ভাই ! চমৎকার ভাই, তাই তাকে নিজের বাগানবাড়ীতে গুম্ করে রেখেছিলেন ?



—বেশ করেছিলাম, সে কৈফিয়ৎ তো আর আমি তোমায় দোব না। তুমি আমার কথার উত্তর দেবে কি না তাই বল ?

—দেখুন, আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে আসিনি। সত্যি কথা বলতে কি,

রবি দত্তের কোন সন্ধান আমি জানি না। আপনি আমায় টাকা দেবেন তো দিন, না দেবেন তো বলুন, আমি যাই।

—বটে, আমার বাড়ী থেকে অতো সহজেই তুমি চলে যাবে?—এই বলে ডাক্তার হাসলো। সে তো হাসি নয়, ডাক্তারের মুখখানা ভীষণ ভয়াবহ হয়ে উঠলো। রহমৎ সে মুখের পানে চেয়ে ভয় পেল। কিন্তু সাবধান হবার অবসর সে পেল না। যে চেয়ারখানিতে রহমৎ বসেছিল তার নীচের মেঝে সরে গেল। সামনের টেবিলটার দিকে সে হাত বাড়ালো, কিন্তু টেবিলটা পর্যন্ত হাত পৌছাবার আগেই নীচের কালো অন্ধকারময় গর্তের মধ্যে সে নেবে গেল। পরমুহূর্তেই গর্তের মুখের তক্তাখানি আবার যথাস্থানে ফিরে এল, নীচে রহমতের চীৎকার আর শোনা গেল না।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে একটু পরেই হাসতে হাসতে ডাক্তার বিনয় রায় বাড়ীর বাহিরে মোটরে গিয়ে উঠলেন। বাড়ীর মধ্যে যে কাণ্ডটা করে এলেন তাঁর মুখের পানে তাকালে এখন আর সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

—এগারো—

নিস্তব্ধ অন্ধকার বাড়ী থম্‌থম্ করছে।

কিন্তু অমন অমাবস্যার মত ঘুটঘুটে অন্ধকারেও একটা লোক স্বচ্ছন্দ গতিতে বাড়ীর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার চলাফেরার ধরণ দেখলে মনে হয় এই বাড়ীর প্রত্যেকটা ঘরে সে যেন এর আগে অনেকবার ঘুরে গেছে।

অন্ধকারে এ-ঘর ও-ঘর বেড়িয়ে কিছুক্ষণ বাদে লোকটা, রহমৎ যে ঘরের মেঝের নীচে পড়ে গিয়েছিল, সেই ঘরে এল। দরজার পাশেই সুইচ্ ছিল, টিপে আলো জ্বাললো। তারপর টেবিলটার ওপাশে গিয়ে ফুলদানিটির পাশে একটা ছোট বোতাম ছিল, সেটা টিপে ধরলো। খুব বেশী সময় লাগলো না, মেঝের উপরকার কাঠের তক্তাখানি সহসা সরে গেল। লোকটা নীচের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলো—কেউ নীচে আছেন?

ব্যাকুল কণ্ঠে জবাব এল—আছি, আমি আছি—

—উপরে আসতে চান?

—কিন্তু যাবো কি করে?

—এই নিন্, এই চেয়ারখানা ধরুন, এটা নীচে রেখে এর উপর উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলুন, আমি আপনার হাত ধরে তুলে নিচ্ছি—বলে উপর থেকে একখানি চেয়ার নামিয়ে দিল।

নীচের লোকটা সেই চেয়ারখানি নিয়ে তার উপর উঠে দাঁড়ালো। তারপর উপর দিকে হাত তুলে দিতেই উপরের লোকটা তার হাত দু'খানি ধরে তাকে উপরে তুললো; এতো সহজে তুললো যে লোকটার দেহে যে যথেষ্ট শক্তি আছে তা বেশ বুঝতে পারা যায়।

উপরে উঠে রহমৎ যাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো, তাতে নিজের চোখকে সে সহজে বিশ্বাস করতে পারলো না। তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রবি দত্ত।

রবি হেসে বললো—রহমৎ, চিনতে পার?

রহমৎ নিজেকে সামলে নিয়ে ডান হাতটা তাড়াতাড়ি কপালে ঠেকিয়ে বললো—সেলাম বাবু!

—মনে রেখো যার অন্নে প্রতিপালিত হয়েও টাকার লোভে যাকে তুমি মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলে, সেই লোকই আজ তোমার জীবন বাঁচালো—মীরজাফর!

রহমতের মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো, ছুটে সে ঘরের মধ্য থেকে বাহির হয়ে গেল।

—বারো—

বিনয়বাবু চোখ মেললেন—

জানালার নীল সার্সীগুলির মধ্য দিয়ে রোদ এসে ঘরখানিকে নীলাভ করে তুলেছে। চারিপাশের দেয়ালের চিত্র-বিচিত্র ঘরখানিকে মায়াপুরীর মায়ায় ঘিরে তুলেছে। ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়। চুপ করে সেই নীলাভ ঘরখানির পানে চেয়ে থাকতে ভাল লাগে। বিনয়বাবুও কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন, দেখে দেখে তবে তিনি বুঝতে পারলেন—স্বপ্ন নয়, সত্য! কিন্তু······এ কোথায় এসেছেন?—কেন এলেন?—কি করে এলেন?

একটার পর একটা করে অসংখ্য প্রশ্ন বিনয়বাবুর মনে জাগলো, কিন্তু জবাব

একটীরও মিললো না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কড়িকাঠের পানে, জানালার নীল সার্সীগুলির পানে চেয়ে কতকক্ষণ পরে বিনয়বাবু উঠে বসলেন। উঠে বসার সময় দেহে সামান্য বেদনা বোধ করলেন, কিন্তু কেন যে বেদনা হয়েছে মনে করতে পারলেন না।

খাট হতে বিনয়বাবু মাটীতে নাবলেন। ইস্প্রিংয়ের খাট, নাবামাত্রই ইস্প্রিংগুলি কচ্ কচ্ করে লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে উঠলো। সেই নাচের তালে তালে বাহিরে কোথায় ঠুংঠুং করে কলিং বেল্ বেজে উঠলো। তার পরেই বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে ভিতরে এলো একজন অচেনা লোক। ভিতরে ঢুকেই হেসে বললো—গুড্ মর্নিং স্যার!

বিনয়বাবু প্রথমে অচেনা লোকটীর এই অভিবাদনের কোন জবাব দিতে পারলেন না।

লোকটী হেসে বললো—অবাক হয়ে গেছেন না? আমি একজন ডক্টর। আপনি এখন কেমন আছেন? দেখি আপনার হাতটা—ডাক্তার বিনয়বাবুর হাতটী টেনে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন—যাক্, আপনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন দেখছি!

বিনয়বাবুর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটলো, বললেন—আপনাকে তো চিনলুম না, আর এটী কার বাড়ী, আমিই বা এখানে এলাম কি করে?

—এ বাড়ী আমার, আমিই আপনাকে নিয়ে এসেছি। পথে মোটরে ধাক্কা লাগার ফলে আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, আমি আপনাকে পথ থেকে তুলে এনেছি।

—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। তবে আমার সঙ্গে আরেকজন লোক ছিল, তার খবর আপনি কিছু জানেন?

—ডেভিড্ তো?

—হ্যাঁ, আপনি তাকে জানলেন কেমন করে?

—ডেভিডকে ভাল করেই জানি। আপনাদের দু'জনকেই আমার দরকার ছিল, তবে দু'জনকে তো পেলাম না—মিষ্টার ডেভিড কোথায় সরে পড়লেন, তাই শুধু আপনাকেই নিয়ে এলুম। যাক্, আপনাকে দিয়েও কাজ হবে।

—আপনার জন্য আমায় কিছু করতে হবে নাকি?

—নিশ্চয়।

—কি করতে হবে ?

—ডাকাতি।

—ডাকাতি ?

—হ্যাঁ, আমার ওই ব্যবসা। ওই জন্যই আমি সরোজকে ধরে এনেছিলাম, আপনাকেও ধরে এনেছি।

সরোজ তাহলে আপনার কথাতেই আমার বাড়ীতে ডাকাতি করে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি তো আর সরোজ নই। আমি আপনার কথা মত ডাকাতি করবো—একথা আপনাকে কে বল্লে ?

—আমি বলছি, আপনি কেন ডাকাতি করবেন না ? বাংলাদেশে একদল লোক আছে, যারা গরীবদের মুখের পানে তাকায় না; অন্নাভাব ও অজন্মার দিনেও নিরন্ন গরীবের বাড়ীঘর জিনিষপত্র নিলাম করে জমিদারীর খাজনা আদায় করে, আর সেই টাকায় বালিগঞ্জে লেকের ধারে মোটরে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, মুর্শিদাবাদী সিল্কের জামা পরে, বক্সে বসে বায়োস্কোপ দেখে, আর দু'পুরবেলা ফ্যানের নীচে বসে ভূঁড়িতে হাত বুলোয়। ওই সব লোকদের বাড়ীতে আপনাকে ডাকাতি করতে হবে, তাদের টাকা লুঠে এনে আমরা নিরন্নদের মধ্যে বিলিয়ে দোব, তার ফলে বর্তমানে বাংলার গ্রামে গ্রামে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তাতে কিছু সাহায্য হবে।

—তা হবে কিন্তু সেজন্য লুঠ করতে হবে আর আমি তাই করবো বলেই কি আপনি মনে করেন ? যারা জমিদার, প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার দাবী তাদের আছে, সেই জন্যই তারা খাজনা আদায় করে, কিন্তু তাদের টাকা লুঠ করার দাবী কি আমাদের আছে ?—তাতো নেই !

—কেন নেই, নিশ্চয়ই আছে। আইনের জোরে গরীবের যথাসর্বস্ব নিলাম করে তারা লুঠে নিচ্ছে, আমরাও পিস্তলের জোরে তাদের কবল থেকে সেই সব টাকা উদ্ধার করে আবার সেই গরীবদেরই বিলিয়ে দোব—শোধ বোধ হয়ে যাবে।

—সবই বুঝলাম, কিন্তু আমি যদি বলি ও-রকম অন্যায় ভাবে ডাকাতি করতে আমি পারবো না।

—কেন আপনি সেকথা বলবেন ? আপনার দেশের অনাহার-ক্লিষ্ট বাঙালীদের

জন্ত আপনার প্রাণ কাঁদে না? (কয়েকখানি খবরের কাগজ পকেট থেকে বাহির করে বিনয়বাবুর সামনে মেলে ধরে) এই দেখুন আনন্দবাজার অমৃতবাজার যুগান্তরের ফাইল্, বাংলার পল্লী অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের কি ভয়াবহ খবর এরা প্রতিদিন ছাপ্ছে, মা হয়ে ছেলেমেয়েদের বিক্রী করে দিচ্ছে একমুঠো অন্নের জন্ত। এই সব বুভুক্ষুর মুখে এক এক মুঠো খাবার পৌঁছে দেবার ইচ্ছা কি আপনার হয় না?

বিনয়বাবু হাসলেন, বললেন—সে ইচ্ছা প্রত্যেকেরই হয়, কিন্তু তা বলে অন্তলোকের বাড়ী থেকে টাকা লুঠ করে এনে তাদের দিতে হবে এমন তো কোন কথা নেই? নিজের যা আছে সেই থেকে দিন্—

—আপনার কথা খুবই সঙ্গত, কিন্তু অতো টাকা আমার হাতে নেই, আর তাড়াতাড়ি অতো টাকা যোগাড় করে দেবার মত আর কোন পথও নেই। পাঁচদিনে পাঁচটী জমীদারকে লুঠ করে পাঁচশো লোকের মুখে যদি আমি অন্ন জোগাতে পারি—তাই আমি চাই!

—কিন্তু আমি তা চাই না।

—আহা, এত বড় একটা ব্যাপারে এতো তাড়াতাড়ি একটা জবাব দেবেন না। এই দুর্ভিক্ষের খবরগুলো আগে পড়ে দেখুন, তারপর বিচার করে জবাব দেবেন, আমি কাল এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবো, এখন যাই, গুড্ ইভি্নিং—বলে আর জবাবের অপেক্ষা না করে ডাক্তার বাহির হয়ে গেল, বাইরে গিয়ে ঘরের দরজাটী বন্ধ করে দিতে ভুললো না।

বিনয়বাবুর ঘর হতে ডাক্তার নীচে নেবে এল। নীচে এককোণে ছোট একখানি অন্ধকার ঘর। দিনের বেলাতেই ঘরখানি এমনি অন্ধকার হয়ে থাকে যে, আলো না জ্বাললে কিছু চোখেই পড়ে না, রাত্রির অন্ধকারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ডাক্তার কিন্তু আলো জ্বাললো না, স্বচ্ছন্দে গট্গট্ করে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ভিতরে ঢুকেও ডাক্তার আলো জ্বাললো না। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর হতে দু'বার ঘট্ ঘট্ করে শব্দ ভেসে এল—কে যেন একটা দরজা খুলে সশব্দে বন্ধ করে দিল, তারপর আর কিছুই শোনা গেল না।

তখন কেউ সেই ঘরের মধ্যে ঢুকলে ডাক্তাকে সেখানে দেখতে পেত না। ডাক্তার সে-ঘরে তখন ছিল না। সেই ঘরের ভিতরেই আরেকটী ঘরে ডাক্তার তখন বসেছিল। বাহিরের লোকের সাধারণ দৃষ্টিতে সেটী একটা দেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয। কিন্তু সেই দেয়ালেরই একপাশের একটি ইস্প্রিং টিপে একখানি

তক্তা সরিয়ে ফেললে ভিতরের এই ঘরখানি চোখে পড়বে। ভিতরে ঢুকলে মনে হবে কোন জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘরের মধ্যে এসে পড়েছি। দেয়ালে ঝুলানো আছে কলিকাতা ও কলিকাতার আশপাশের রাস্তার কয়েকখানি মানচিত্র, আর টেবিলের উপর পড়েছিল একখানি বড় মোটা খাতা। ডাক্তার প্রথমে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে কতক্ষণ ধরে একখানি ম্যাপ্ দেখলেন তারপর ফিরে এসে চেয়ারে বসে সেই বড় খাতাখানির কয়েক পৃষ্ঠা উল্টে একটী প্ল্যান বাহির করলেন। প্ল্যানটী একটী বাগান-বাড়ীর প্ল্যান। যে বাড়ীতে রহমৎ সরোজকে আট্‌কে রেখেছে সেটী সে বাড়ীরই রেখাচিত্র, যে জানে সে একবার দেখেই তা ধরে ফেলবে।

প্ল্যানের প্রত্যেকটী ঘর দরজা সিঁড়ি বারান্দা—সব বিশেষ ভাবে ক'বার দেখে নিয়ে ডাক্তার উঠে পড়লেন। আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে টেবিলের 'টানা' হতে একটা পিস্তল বাহির করলেন। দু'বার ঘট্ ঘট্ করে দেয়ালের কাঠের দরজাটি খুলে যাবার ও বন্ধ হবার শব্দ হোল। পিস্তলটা পাৎলুনের পকেটে ফেলে ডাক্তার বাহির হয়ে পড়লেন।

মোটরে উঠে সোফারকে বললেন ঠাকুরঘাট, বরাহনগর।

সোফার মোটর ছেড়ে দিল।

—তেরো—

ডাক্তারের ভূগর্ভ হতে রক্ষা পেয়ে রহমৎ যখন বাগানে ফিরলো তখন তার মেজাজ গরম হয়ে উঠেছে। ডাক্তার যখন তারও জীবন নিয়ে খেলা করতে সুরু করেছে, সেও তা হজম করবে না, সেও একবার ওই ডাক্তারকে বুঝে নেবে, বুঝিয়ে দেবে রহমৎ কী মানুষ!

ফিরে এসে রহমৎ একেবারে সরোজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো, বললো—দেখুন সরোজবাবু, আপনার জন্য আজ প্রাণটী যেতে বসেছিল!

কেন, পুলিশ তাড়া করেছিল বুঝি?

—পুলিশ? হা-হা, পুলিশকে এই রহমৎ কেয়ার করে না সরোজবাবু—

তবে?—সরোজের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, বিস্ময়ে রহমতের মুখের পানে তাকিয়ে বললো—আরে, তোমার পিঠের কুঁজ কোথায় গেল?

—আর কুঁজ ! কুঁজ রেখেছিলুম ছদ্মবেশের জন্য, এখন আর তার দরকার নেই, এখন শুধু আপনার কাছ থেকে একটা কথা পেলেই হয় !

—বলুন ?

—আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে চাই, যেজন্য আপনাকে আমি ধরে রেখেছিলাম তা ব্যর্থ হয়েছে, সেই জন্যই আমি অনর্থক আপনাকে আর আটকে রাখবো না, তবে আপনাকে ছেড়ে দেবার একটা সর্ত আছে, মুক্তি পেয়েই আপনি যে গট্‌গট্‌ করে চলে যাবেন, সেটা হবে না। আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে, আমি সেই লোকটাকে পুলিশে ধরিয়ে দোব, আমায় সাহায্য করতে হবে—

—কোন্ লোকটাকে ?

—সে একজন ডাক্তার, ডাক্তার বিনয় রায়, যে আপনাকে ধরে এনে হিপ্‌নোটাইজ করে, আপনাকে দিয়েই আপনার বাড়ীতে চল্লিশ হাজার টাকা ডাকাতি করিয়েছে—

—আমায় দিয়ে আমারই চল্লিশ হাজার টাকা···

—হ্যাঁ। আপনি তো আর সজ্ঞানে করেন নি, তাই আপনি না জানতে পারেন, কিন্তু আমরা জানি। সেই অপরাধে পুলিশ আপনাকে ধরেছিল, কিন্তু আপনি পুলিশের হাত ফস্‌কে পালিয়ে আসেন, আপনার নামে এখন 'বডি-ওয়ারেণ্ট' আছে—

—আমার নামে বডি-ওয়ারেণ্ট ! আমার বন্ধুই যে পুলিশে চাকরী করে।

—হ্যাঁ, সেই বন্ধু সার্জেণ্ট ডেভিড্‌ই আপনাকে গ্রেপ্তার করেছিল।

সরোজ এমন অবাক হয়ে গেল যে, তার মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ আর কথা সরলো না।

রহমৎ বলে চললো যে লোকটা এই সব কাজ করছে, সে দু'বার আমাকেও 'খতম' করে দেবার চেষ্টা করেছিল। তার আসল রূপটা আমি পুলিশকে দেখিয়ে দিতে চাই; এখনি আমি একবার তার আড্ডায় যাব। আপনাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, আপনার কোন আপত্তি আছে ?

এতক্ষণে সরোজের যেন তন্দ্রা ভাঙলো, বললো—কি বলছেন আপত্তি,—না আপত্তি আমার কিছুই নেই।

—তাতে কিন্তু জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনাও আছে—

—তাই তো আমি চাই—এড্‌ভেঞ্চার আমি ভালবাসি। সেই ডাক্তারের আড্ডা এখান থেকে কদ্দূর ?

— বেশী দূর নয়, নন্দীগড়ে—এখান থেকে বড় জোর মাইল দশেক দূর হবে। সেখানে গেলেই বুঝবেন, সে কি রকম মারাত্মক লোক। আপনি এদ্দিন সেখানে থাকলে বেঁচে থাকতেন কিনা সন্দেহ—

—আর বাঁচার দরকার নেই—!

সহসা পিছনে কঠোর স্বরে কে কথাগুলি বললো, দু'জনেই চমকে উঠলো! তাকিয়ে দেখে পিছনে দাঁড়িয়ে পিস্তলধারী ডক্টর বিনয় রায়। কোটের পকেট ঠেলে ষ্টেথিস্কোপ্টা মাথা তুলেছে।

—চমকে উঠ্‌লে যে, তোমাদের দু'জনকেই সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য আমি মোটর নিয়ে এসেছি—বলে ডাক্তার দু'জনের মুখের উপর পিস্তলটা তুলে ধরলো।

তখনও দু'জনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ডাক্তার আদেশের স্বরে বললো —এসো—!

—কোথায় যাবো?—রহমৎ জিজ্ঞাসা করলো।

—উপস্থিত বাড়ীর বাইরে আমার মোটরে, তারপর আমার ল্যাবরেটরীতে···

সরোজ বললো—যদি না যাই?

—সে রোগের ওষুধ আমার হাতেই রয়েছে—বলে ডাক্তার পিস্তলটা দেখালো।

সরোজ হাসলো, বললো—পিস্তল আমায় দেখাবেন না, আমি লড়াই-ফেরৎ। জার্মাণ যুদ্ধের সময় এরোপ্লেনে বসে বোমা ফেলেছি, মেসিন্ গান চালিয়েছি আর আজ আপনার হাতের একটা পিস্তল দেখে ভয় খাবো মনে করেন?

—ভয় না খেলেই গুলি খাবেন—বলেই ডাক্তার পিস্তলের ঘোড়া টিপলো।

ডাক্তার পিস্তলের ঘোড়া টিপেছিল রহমৎকে লক্ষ্য করে। ডাক্তারের কবল হতে পালাবার জন্য রহমৎ একটা ফিকির খুঁজছিল, সরোজ ও ডাক্তারের কথাবার্তার সুযোগে সে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কিন্তু ডাক্তারের তীক্ষ্নদৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

গুলিটা রহমতের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখটা উড়িয়ে দিল। রহমৎ যাতনায় আর্তনাদ করে উঠলো।

ডাক্তার হাসলো, বললো—আমার চোখের তাগ্ এখনও ঠিক আছে বুঝলে রহমৎ, তোমাকে শায়েস্তা করতেও আমি জানি।

রহমৎ একবার রক্ত চক্ষে ডাক্তারের পানে তাকালো।

ডাক্তার বললো—অমন করে তাকাচ্ছ যে ?

রহমৎ এবার রাগে দুঃখে গর্জে উঠলো, বললো—আমিও জানি, তোমায় শায়েস্তা করতে !

হাহা করে ডাক্তার হেসে উঠলো, বললো—তা জানলেও আর কোন দরকারে লাগবে না, রহমৎ। আমার বাড়ী থেকে যত সহজে পালিয়েছ, আমার পিস্তলের মুখ থেকে পালানো তত সহজ নয়—একটী নমুনা তো পেয়েছ, দরকার হলে আরো পাবে—

রহমৎ কোন কথা বললো না, রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য বুড়া আঙ্গুলটী টিপে ধরে রুমাল দিয়ে বেঁধে নিল।

ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা শেষ হলে ডাক্তার বললো—চলো, সরোজবাবুকে নিয়ে আমার আগে আগে চলো, বাইরে আমার মোটর দাঁড়িয়ে আছে—

দুর্দান্ত লোকটির সঙ্গে বেশী কথা না বলাই ভাল, অদৃষ্টে যা আছে হবে। সরোজ আর বাক্যব্যয় না করে অগ্রসর হোল। রহমৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার পিছনে চললো। দু'জনের কেউ কোন ফাঁক দিয়ে যেন সরে পড়তে না পারে, সেজন্য তাদের পিছনে পিস্তল বাগিয়ে ধরে চললো ডাক্তার।

—চৌদ্দ—

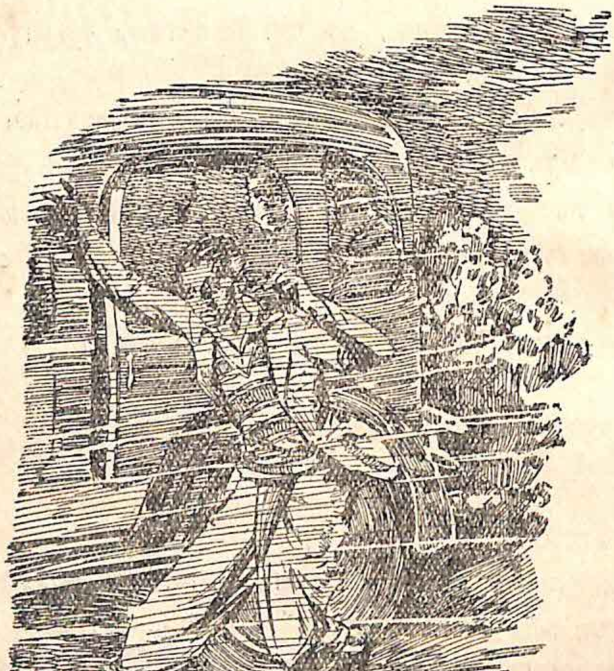
মোটর ছুটেছে।

ভিতরে ড্রাইভার ও তিনজন যাত্রী। সামনে সোফার বসে মোটর চালাচ্ছে, পিছনে দু'জন বন্দীর সামনে পিস্তল ধরে বসে আছে ডাঃ বিনয় রায়।

রাত্রির অন্ধকার পিছনে ঠেলতে ঠেলতে চারজন যাত্রী নিয়ে মোটর গাড়ীর চাকা ঘুরছে। যে অন্ধকার এতক্ষণ সামনের পথে জমাট বেঁধে চোখকে ধাঁধা লাগাচ্ছিল ছুটন্ত মোটরের হেড্-লাইটের আলোয় সেই অন্ধকার ভয় পেয়ে কিল্‌বিল্ করে সরে গিয়ে ছুটে মোটরের পিছনে গিয়ে জমা হচ্ছে। অন্ধকারের এই ছুটাছুটি দেখে আকাশের তারাগুলি মিট্ মিট্ করে হাসছে। সরোজ সেই অন্ধকারের পানে তাকিয়ে নানা কথা ভাবছিল, তার জীবনে একটীর পর একটী করে এতো বিপদ এসে আঘাত করে কেন,—সরোজ মনে মনে তারই কারণ খুঁজছিল।

গঙ্গার পাশ দিয়ে মোটর ছুটছিল, জলো হাওয়ার এক একটী ঝাপ্‌টা মাঝে

মাঝে সরোজের চিন্তারত উত্তপ্ত মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সরোজের মাথায় তখন ঘুরছিল পালাবার কথা। এই ডাক্তার লোকটী যে ভাবে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে সে যে তাদের সঙ্গে বিশেষ ভাল ব্যবহার করবে তা তো মনে হয় না। এর কবল হতে যত শীঘ্র সরে পড়া যায় ততই মঙ্গল। যে এক জোড়া চোখ আর পিস্তলের নলটী তার পানে তাগ্ করে আছে, ওটাকে কোনরকমে একবার অন্যমনস্ক করে দিতে পারলেই হয়!



সরোজের মাথায় তখনই একটা দুষ্টবুদ্ধি গজালো, পাশের একটা বাগানের পানে তাকিয়ে সে চীৎকার করে উঠলো—আরে, অত বড় বাঘ!

ডাক্তারের চোখ ওপাশে বাগানের দিকে ফিরলো, পিস্তলের চোঙটীও লক্ষ্যভ্রষ্ট হোল।

রহমৎও পায়ের যাতনা ভুলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকালো।

সরোজ ইহাই আশা করেছিল, এই সুযোগ সে ছাড়লো না, এক লাফে মোটর ছেড়ে পথে গিয়ে পড়লো। পথে পড়েই ছুটলো গঙ্গার দিকে। যুদ্ধের সৈনিক হবার সময় সরোজ এই সব কসরৎ অভ্যাস করেছিল বলেই রক্ষা, না হলে অন্য লোক হলে মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে তাকে আর ছুটতে হত না, তা সুনিশ্চিত।

ডাক্তারের পিস্তল তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠলো—দুম্! দুম্!

মোটর থেমে গেল।

পকেট থেকে টর্চ বাহির করে ডাক্তার আলো ফেললো সরোজের দিকে, সরোজ তখন গঙ্গার ঢালু তট দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। ডাক্তার পরপর আরো দুটী গুলি ছুঁড়লো।

তখনও ভিজা মাটী দিয়ে খানিকটা গেলে তবে নদীর জল। প্রথম গুলিটী সরোজের হাতের পাশ দিয়ে চলে গেল, দ্বিতীয় গুলির সঙ্গে সঙ্গে সরোজ নদীতটে লুটিয়ে পড়লো।

গুলি তা হলে লেগেছে! তার মত লোকের হাত ফসকে পালানো কি সোজা কথা! হেসে ডাক্তার সরোজকে তুলে আনার জন্য মোটর থেকে নাবলো। রহমৎকে দেখিয়ে সোফারকে বললো—এই, দেখিস্ না ভাগে—

সরোজ ডাক্তারের এই অন্যমনস্ক হবার সুযোগটুকুরই প্রতীক্ষা করছিল। গুলি তার লাগে নি। ডাক্তার মোটর হতে নামার অবসরটুকুর মধ্যেই, সরোজ মাটী ছেড়ে উঠে ছুটে গিয়ে জলে পড়লো। ডাক্তার এসে টর্চের আলোয় অনেক খোঁজাখুঁজি করলো, কিন্তু সরোজের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না।

একটী শিকার তা হলে সত্যই ডাক্তারের হাতছাড়া হয়ে গেল!

একা রহমৎকে নিয়েই ডাক্তারের মোটর ছুটলো। পূর্বের মত সেই অন্ধকার-ঘন বনানী-ঢাকা মেঠো পথের উপর দিয়ে ছরছর করে চাকা ঘুরে চললো।

কতকক্ষণ মোটর ছুটলো, বোধ হয় মিনিট দুই-তিনের বেশী হবে না। একটী পথের মোড়ে আসতেই ডাক্তার সোফারকে বললো—মোটর ফেরাও!

—কোন্ দিকে?

—ফিরে চলো যে-পথে এসেছি, হেড্ লাইট্ জেলো না। সোফার মোটর ঘুরিয়ে যে-পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে চললো।

এবারকার মত বিপদ কেটে গেছে ভেবে সরোজ তখন সবেমাত্র জল থেকে উঠে

কাপড়-জামাটা নিংড়ে নিয়ে কোন রকমে গায়ের জল মুছে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভাবেই অনেকখানি পথ তাকে তখন হেঁটে যেতে হবে, কতদূর গেলে একখানি গাড়ী পাওয়া যাবে কে জানে! তবে মুক্তি মিলে গেছে এই যা কথা, কিন্তু তার মূল্যও বড় কম দিতে হয় নি, মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে হাঁটুতে যা লেগেছে, এখনও খচ্‌খচ্‌ করছে। এখন কোন রকমে একখানা গাড়ী ধরে কলকাতায় যেতে পারলে হয়!

সহসা পিছনের পথে গাড়ীর আলো দেখা গেল, মোটর বলেই মনে হয়। কাছে আসতেই হাত তুলে সরোজ মোটর থামালো, ড্রাইভারকে বললো—আপনি দয়া করে আমায় একটু এগিয়ে দেবেন, বাসের রাস্তা পর্যন্ত······

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যই তো এতটা পথ আবার ফিরে এলুম।—

সরোজ সেই স্বর শুনে চমকে উঠলো। ভাল করে কিছু ভেবে নেবার আগেই, হেড লাইট দুটী জ্বলে উঠে তার চোখ দুটীকে ঝল্‌সে দিল, আর তারই সঙ্গে তার কপালে এসে লাগলো পিস্তলের একটী ঠাণ্ডা চোঙ্‌।

হা-হা-হা করে পিস্তলধারী হেসে উঠলো, বললো—আমার হাত থেকে পালানো খুব সহজ নয়, সরোজ বাবু। বুদ্ধিতে আমি আপনার চেয়েও সয়তান! এখন ভাল ছেলের মত সুড়-সুড় করে মোটরের ভেতরে আপনার পুরাণো স্থানটীতে গিয়ে বসে পড়ুন দেখি—

ধীরে ধীরে সরোজ মোটরে উঠে রহমতের পাশে বসে পড়লো। পিস্তলের চোঙটী তখনও তার কপালের উপর তুলে ধরা ছিল।

ডাক্তার সোফারকে আদেশ দিল—চলো—!

—পনেরো—

ডেভিড ও সনি মুখোমুখী বসেছিল।

ঘরে একটীও শব্দ নেই, শুধু ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ স্পষ্ট হয়ে দু'জনের কানে এসে বাজছে।

আধঘণ্টা হয়ে গেল, তারা এই একই ভাবে বসে আছে, মুখে কারও কথা নেই। সব কথা ফুরিয়ে গেছে। মনের অবস্থা বড়ই খারাপ। সরোজ

নিরুদ্দেশ, বিনয়বাবুকেও কোথায় আটক করে রাখা হয়েছে, ক'দিন কেটে গেল রহস্যের তো এতটুকু কিনারা করতে পারলো না—অন্ধকারের বুকে একটা ক্ষীণ আলোকশিখাও তো ফুটলো না! বন্ধু দুটীর কি হোল কে জানে!

দু'জনে মুখোমুখী বসে ভাবছে—কোন্ দিক দিয়ে অগ্রসর হলে রহস্যের কিনারা করা সহজ হবে।

দরজা খোলা ছিল, সহসা মস্‌মস্ করে একটি লোক এসে একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ডেভিড ও সনি তো একেবারে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো —কোন শত্রু নাকি!

লোকটী জিজ্ঞাসা করলো—পুলিশ-সার্জেণ্ট মিষ্টার ডেভিড বাড়ীতে আছেন?

—আমারই নাম, কেন বলুন তো?—ডেভিড বললো।

—আমি লালবাজারেই প্রথমে যাই, সেখান থেকে আপনার ঠিকানা নিয়ে এখানে আস্‌ছি, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে—

—কি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—আপনার বন্ধু সরোজবাবুর সম্পর্কে। সে অনেক কথা, তার আগে একটু জিরিয়ে নি। আজ সারাদিন যা হাঁটাহাটি করতে হয়েছে, সে আর কি বলবো। পাখাটা জোরে খুলে দিন! তারপর আপনাদের খুলে বলছি সব কথা—বলে নবাগত ভদ্রলোকটী কারও কোন কথার অপেক্ষা না রেখে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

সনি ও ডেভিড লোকটির গায়ে-পড়া ব্যবহার দেখে বিস্ময়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইল।

মিনিট পাঁচেক নিশ্চিন্তমনে হাওয়া খেয়ে নিয়ে সনি ও ডেভিডের মুখের পানে চেয়ে আগন্তুক একটু হাসলো, বললো—আপনারা আমার ব্যবহারে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু কি করি বলুন······

—না, না বিরক্ত হব কেন!—সনি ও ডেভিড এক সঙ্গে বলে উঠলো—সরোজের যে খবরটি আপনি জানেন, যদি সেটা এবার বলেন, আমরা আর ধৈর্য ধরে থাক্‌তে পারছি না।

—নিশ্চয়ই বলবো, বলার জন্যই আপনাদের এখানে এসেছি, তবে সে কথা বলার আগে আমার নিজের একটু পরিচয় দেওয়ার দরকার। আমার নাম রবি দত্ত।

—আর্টিষ্ট রবি দত্ত ?—ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো।

—হ্যাঁ, লোকে আমায় আর্টিষ্ট রবি দত্ত বলেই জানে। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, প্রভৃতি মাসিকে আমার আঁকা অনেক ছবি বেরিয়েছে।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করলো—নন্দীগড়ে গঙ্গার ধারে আপনার বাড়ী না ?

—হ্যাঁ !

—সেই বাড়ীতে আমরা আর্টিষ্ট রবি দত্ত নামে আরেকজন লোককে গ্রেপ্তার করি।

—তা আমি জানি। আর যাকে আপনি গ্রেপ্তার করেন সে সরোজবাবু।

—তখন আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলেননি কেন ?

—সেই কথাই তো বল্‌ছি, শুনুন : আমার বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন আমার একার পক্ষে তা যথেষ্ট। আমার তো আর কাজকর্ম কিছু ছিল না, বসে-বসে ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব ঠিক করতাম আর কাগজের বুকে তুলির আঁচড় টানতাম। সেই সময় আমার এক পিস্‌তুতো ভাইয়ের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা জন্মে। ছেলেটী আমার সমবয়সী, নতুন ডাক্তারী পাশ করে তখন প্র্যাক্‌টিস্‌ সুরু করেছে। ছেলেটীর হাতে পৈতৃক টাকা-কড়ি কিছু ছিল, আর ছিল অসংখ্য আজগুবি খেয়াল। আর সেই খেয়ালের জন্য অবিরাম রাত জেগে বসে বসে বই পড়ে গবেষণা করতেই সে ভালবাসতো। বুদ্ধিহীন ছেলেদের ইঞ্জেক্‌শন দিয়ে মেধাবী করে তোলা যায় কিনা, কি করলে রোগা লোক মোটা হবে, বেঁটে লোক লম্বা হবে, ইলেকট্রিসিটি দিয়ে পক্ষাঘাতের রোগীর দুর্বল হাত পা সবল হতে পারে কি না—এই সব এক একটী খেয়ালের পিছনে ডাক্তার বহু রাত জেগে কাটাতো। এই সব সম্পর্কে নিত্য নতুন ঔষধ-পত্র আর যন্ত্রপাতি কিনেও বহু টাকা খরচ করতো। আপনার লোক বলতে তো আর কেউ ছিল না। আমিই ছিলাম তার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমার কাছে এসে রোজই সে তার এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের গল্প করতো, বসে বসে শুনতাম।

আমাদের দু'জনে বন্ধুত্ব জমেছিল খুব। আমি বসে বসে ছবি আঁকি। ডাক্তার দেখে আর প্রশংসা করে বলে, 'তোমার মধ্যে জগজ্জয়ী শিল্পী র‍্যাফেলের প্রতিভা লুকিয়ে অছে।' আর আমি তার গবেষণা শুনে বলি—'অদূর ভবিষ্যতে ডাক্তার বিনয় রায়ের নাম ম্যাডাম কুরী আর লুই পাস্তরের পাশেই বসবে।'

সহসা একদিন ডক্তার এসে বললো—আজকের কাগজ দেখছ ?

জিজ্ঞেস করলাম—কেন ?

—বোম্বের রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের খবরটা পড়েছ ? সাপে কাম্‌ড়াবার ওষুধ বা'র করতে পারলে নগদ দশহাজার টাকা আর তার সঙ্গে চিরস্মরণীয় খ্যাতি।

সেদিন খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল :—ভারতবর্ষে প্রায় দু' হাজার লোক প্রতি বছর সাপের কামড়ে মারা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোজারা 'ঝাঁড়-ফুঁক্' করে বটে কিন্তু লোককে বাঁচাতে পারে না। মন্ত্রেই হোক্ আর ওষুধেই হোক যিনি সত্যই সাপের বিষ নামাতে পারেন তিনি যদি তাঁর সেই পদ্ধতিটা বোম্বের রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষকে জানান এবং ভারতের ছাত্রগণের জন্য সেই পদ্ধতিটা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তা হলে বোম্বের মেডিক্যাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট থেকে তাঁকে দশহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, এবং শুধু ভারত কেন, জগতের চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা হবে।

ডাক্তার বললো—আমি এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবো বলে ঠিক করেছি, কাল সকালের ট্রেণেই আমি মেদিনীপুর যাচ্ছি। সেখানে অনেক বড় বড় রোজা আছে বলে শুনেছি।

—কিন্তু মেদিনীপুর গেলেই যে কিছু মিলবে তার তো কোন স্থিরতা নেই, এদিকে প্র্যাক্‌টিস্ নষ্ট হবে যে ?

—মেদিনীপুরে না হয় আসামের মণিপুরে যাবো। সেখানে না হয় আরেক জায়গায় যাবো। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঘুরবো— যে ক' টাকা আছে সব খরচ করবো। ওষুধ যদি পাই, আমার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তার জন্য যদি যায় তো যাক্ প্র্যাক্‌টিস্ - সব যাক্, আমি নাম্‌কো ওয়াস্তে সব করবো, বুঝ্‌লে! কাল সকালেই আমি যাবো মেদিনীপুরে, কেউ আমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না—

পরদিনই ডাক্তার চলে গেল।

সেই যে গেল, ছ'মাস আর কোন খোঁজ খবর নেই, একখানি চিঠি পর্যন্ত পাইনি। লোকটা বেঁচে আছে কিনা ভাবছি, সহসা একদিন একেবারে আমার বাড়ী এসে হাজির, বললে—জানো রবি, কেল্লা ফতে !

বললাম—কি রকম ?

বললে—গুরু পেয়েছি, জিনিষ পেয়েছি, এখন পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কিছু টাকার দরকার!

—জোগাড় করো—

—কিন্তু দেবে কে ?

—না হলে, আবার প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করে দাও।

—প্র্যাক্‌টিস্ আর করবো না, প্র্যাক্‌টিস্ করলে রিসার্চের মোটেই সময় থাকে না।

—তাহলে টাকা পাবে কোত্থেকে ?

—সেই কথাই তোমায় বলতে এলাম। তুমি আমায় সামান্য কিছু টাকা ধার দাও, তুমি না দিলে আমি আর কোথাও টাকা পাব না, আমার এই সব রিসার্চের ব্যাপার আর কেউ বুঝবে না, বিশ্বাস করবে না।

সেই যে ডাক্তার ধরে বসলো, ক'দিন আমার পিছনে হাঁটাহাঁটি করে হাজার খানেক টাকা নিয়ে তবে ছাড়লো!

তারপর ক'দিন আর ডাক্তারের দেখাই নেই, দিন পনেরো বাদে এসে বললো, —আরো কিছু টাকা চাই।

বললাম—এর মধ্যেই হাজার টাকা ফুরিয়ে গেল ?

বললো—এখন দাও, প্রাইজটা পেলে সব শুধে দোব।

সেবারও ডাক্তার আমার কাছ থেকে শ'পাঁচেক টাকা নিয়ে গেল।

ক'দিন বাদে আবার আমায় এসে বলে—আরো কিছু টাকা দাও—

অমন ভাবে টাকা দিতে আমি পারবো কেন ? বললাম—পারবো না।

বললো—এখন দাও, দশহাজার টাকা প্রাইজ পেলেই শুধে দোব।

বললাম—প্রাইজ পাবে কি না পাবে তার তো কোন স্থিরতা নেই, তার উপর নির্ভর করে আমি প্রতিবারে অত টাকা তোমায় দি কেমন করে ?

—বেশ, তুমি তাহলে আর টাকা দেবে না তো, আচ্ছা—বলে চলে যাবার সময় ডাক্তার আমায় শাসিয়ে গেল।

এরই দিন দুয়েক বাদে একদিন রাত্রে বায়োস্কোপ দেখে ফিরছি। বাড়ীর কাছাকাছি এসেছি, এমন সময় সহসা কোথা থেকে একটা লোক এসে আমায় পিছন থেকে চেপে ধরলো। অনেক চেষ্টা করলাম তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে কোনদিন তো আর ব্যায়াম কিম্বা যুযুৎসু

অভ্যাস করি নি, কিছুতেই তার কবল থেকে মুক্তি পেলাম না। চীৎকার করবো কি, আমার দু'কানের নীচে দুটী শিরা এমন ভাবে সে টিপে ধরলো যে তখনই আমার দু'চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এল। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।



জ্ঞান যখন হোল, চোখ মেলে দেখি আমারই বাড়ীর শোবার ঘরে আমারই বিছানায় শুয়ে আছি, তবে হাত দুটী বাঁধা। আমার চাকর রমেন বিছানার একপাশে বসে আছে দেখে বললুম – হ্যাঁরে আমার হাত বাঁধা কেন? খুলে দে—

—নেহি!

—কেন রে, আমার হাতে যে ভয়ানক লাগছে।

—চুপ রহ!

আমি তো অবাক! রমেন চিরকাল আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলে এল, আজ আমায় হিন্দিতে ধমকায় কেন! বললাম—কিরে, কি হোল তোর বল দিকি?

রমেন কোন জবাবই দিল না।

বললাম – কিরে কথা বলছিস্ না যে?

—কি বলবো?

—কি বলবো মানে? আমি হাত বাঁধা পড়ে আছি তুই তাই বসে দেখছিস্, আমার হাতের বাঁধনটা খুলে দে—

—হুকুম নেই।

—আমিই তো তোর মনিব, আবার হুকুম কার?

—আমার—বলো ডাক্তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো, বললো—সে হুকুম আমার।

—তার মানে ?

—তার মানে বিশেষ কিছুই নয়। আমার কিছু টাকা চাই। টাকার জন্য আমার এতবড় একটা রিসার্চ তো আর বন্ধ রাখতে পারিনা! তোমার আছে তুমি দাও, সৎকাজে খরচ কর। আর যদি না দাও তো তোমায় আমি হাত পা বেঁধে এমনিভাবেই ফেলে রেখে দোব।

—তাহলেই বন্ধুপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখানো হবে !

—বন্ধুপ্রীতি ? এই দুনিয়ায় বন্ধুত্ব কথাটাই শুধু আছে, সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই। আর নামের কাছে, খ্যাতির কাছে বন্ধুত্বের মূল্য কি ? আমি নাম চাই—নামই অমরত্ব! এর জন্য আমি নিজে সর্বস্ব খুইয়েছি, শেষে তোমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার চেয়েছিলুম, সামান্য টাকা দিয়েই তুমি পিছিয়ে গেলে, এই তো তোমার বন্ধুত্ব! বন্ধুর জন্য তুমি কি আর কিছু টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে পারতে না ? তুমি এখনও আমায় কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য কর, আমি তোমায় এখনি ছেড়ে দিচ্ছি।

—এর পরেও বন্ধু হিসাবে আমি টাকা দোব বলে তুমি মনে কর ?

—বেশ, দাও কি না দাও দেখাই যাবে, ক'দিন এইভাবে থাকতে পার দেখি—বলে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমার বাড়ীতে আমার শোবার ঘরেই আমি বন্দী হয়ে রইলাম। আর আমার পাহারাদার হোল আমারই চাকর!

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আমি সেই ঘরে পড়েছিলাম, তার মধ্যে আমায় একগ্লাস তৃষ্ণার জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

সেই রাত্রেই রমেন ঘুমিয়ে পড়লে দাঁত দিয়ে হাতের বাঁধন খুলে নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে পালিয়ে আসি। কেউ জান্‌তে পারেনি।

পালিয়ে আমি দূরে কোথাও যাইনি। আমার বাড়ীর একপাশে একখানি ভাড়াটে বাড়ী খালি ছিল, সেখানেই ক'দিন লুকিয়ে রইলাম ডাক্তারের হালচাল আর গতিবিধি সব লক্ষ্য করার জন্য। কিন্তু একদিনও ডাক্তারকে দেখতে না পেয়ে, সেদিন দুপুরে গঙ্গার তীরে বসে নানা কথা ভাবছি,—কি করবো, আর কি করা উচিৎ, এমন সময় গাছের উপর থেকে একখানি কাগজ আমার সামনে পড়লো।

কাগজখানি স্থতোয় জড়ানো দেখে কি যেন মনে হোল, কুড়িয়ে নিলাম। দেখি পাতলা অয়েল-পেপারের উপর ফুটো করে কয়েকটী অক্ষর লেখা একখানি চিঠি।— এই দেখুন – বলে জামার পকেট থেকে একখানি কাগজ বাহির করে সে ডেভিডের হাতে দিল।

ডেভিড কাগজখানি ভাল করে নেড়ে চেড়ে দেখলো, আলোর সাম্‌নে তুলে ধরে একবার পড়লো। চিঠিখানি সরোজের, আমরা অনেক আগেই এর কথা জানি।

রবি বলে চললো—যে বাড়ীটার কথা চিঠিতে লিখেছে—a red-brick two-storied house, surrounded by a garden and a wall, a pond just outside the wall—পড়েই একটী বাড়ীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। বাড়ীটী আমার বাড়ী থেকে মাইলখানেক পথ হবে। গিয়ে দেখি দরজা জানালা সব বন্ধ, অনেক ডাকাডাকি করলাম। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে, কেমন-যেন মনে হোল, পাঁচিল টপ্‌কে ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। ভিতরের বাগানটুকু পার হয়ে বাড়ীর দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছি, দেখি দরজা খুলে আমার খানসামা রহমৎ বেরিয়ে এসেছে, সে তো আমায় চিনেও চিনলে না, শেষে আমায় একটা ইট ছুড়ে মারতে এল······

তারপর রবি একে একে বললো রহমতের সঙ্গে তার কি কি কথা হয়েছিল··· রহমতের পিছু নিয়ে কিং করে ডাক্তারের বাড়ী গিয়া সে রহমতের জীবন বাঁচিয়েছিল···সেই সব কথা।

শেষে আর্টিষ্ট বললো—আমার বিশ্বাস সরোজবাবু ওই ডাক্তারের হাতেই বন্দী হয়েছে। তাঁকে আপনারা নিশ্চয়ই উদ্ধার করতে চান আর আমি চাই ডাক্তারকে জব্দ করতে, কাজেই আমাদের উদ্দেশ্য ছ'রকম হলেও কাজ করতে হবে একসঙ্গে, আমি তাই আপনাদের সাহায্য চাই—

— নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে সাহায্য করবো, আপনি যা বলবেন তাই করবো—

—বেশ তাহলে জন চারেক বন্দুক-ধারী পুলিশ নিয়ে আপনারা এখনি বেরুবার ব্যবস্থা করুন, একমিনিট দেরী করা আমি পছন্দ করি না।

—নিশ্চয়ই !

সনি ও ডেভিড বাহির হবার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

—ষোল—

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে একখানি মোটর একটী বাগানবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখে কোন কথাটী না বলে সাতজন আরোহী একে একে মোটর হতে নেমে পড়লো। বাগানের ফটক খোলাই ছিল। বাগানের মাঝে ছোট দোতলা বাড়ীখানি থম্ থম্ করছে। পল্লীর স্তব্ধতা তার বিরাট পাখা মেলে মায়ের মত স্নেহে বাড়ীখানি ঢেকে রেখেছে। সামান্য আলোর আভাষটুকুও বাইরে পাওয়া যায় না।

বাড়ীর দরজা খোলা, তবে কি তারা আগে থেকে খবর পেয়ে সরে পড়েছে নাকি? তা হলে এখানে আসার সবটুকু পরিশ্রমই তো নষ্ট! সাতটা লোক টর্চের আলোয় বাড়ীর ক'খানি ঘর দেখে শেষ করে ফেললো, একটী প্রাণীকেও দেখতে পেল না। খালি বাড়ীখানি হাঁ হাঁ করছে, কেউ যে কোন-দিন সে বাড়ীতে ছিল, তা মনে হয় না।

ডেভিড শেষে জিজ্ঞাসা করলো—এই বাড়ীই তো ঠিক রবিবাবু?

—নিশ্চয়ই!

—তাহলে সব পালিয়েছে। আমাদের এতদূর আসাই অনর্থক পরিশ্রম হোল।

—আমারও তাই এখন মনে হচ্ছে।

—তাহলে শেষ পর্যন্ত সরোজকে আমরা উদ্ধার করতে পারলাম না!

—দেখুন, ফিরে যাবার আগে আমার বাড়ীতে একবার খোঁজ করা যাক, চলুন, সেখানে ডাক্তার তো একটা আড্ডা করেছে, সেখানেও তো সরোজবাবুকে পাওয়া যেতে পারে।

…চলুন আমার কোন আপত্তি নেই, সরোজকে খুঁজে পাবার যেখানে যতটুকু আশা আছে, সেখানেই আমি যাব, যে বন্ধু বহু বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার জন্য আমার সব কিছু করা দরকার—

সকলে মোটরে ফিরে এল। মোটর আবার ছুটতে সুরু করলো।

এবার মোটর এসে থামলো আর্টিষ্টের বাড়ীর সামনে।

একটী ঘরে আলো জ্বলছে, জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে পথের উপর।

ডেভিড্ মোটর থেকে নেবে পড়ে বললো—ওই ঘর থেকে আমরা সরোজকে ধরে নিয়ে যাই—

আর্টিষ্ট বললো—হ্যাঁ, ওইটাই আমার ষ্টাডি, ওই ঘরে বসেই আমি ছবি আঁকতাম। আপনারা যখন সরোজবাবুকে ধরেন, তখন আমি ডাক্তারকে জব্দ করার জন্য লুকিয়ে বেড়াচ্ছি।

—কিন্তু এইবার আমরা তোমায় খুঁজে পেঁয়েছি!

পিছন থেকে গম্ভীর স্বরে কে বলে উঠলো, এমনি গম্ভীর সে স্বর যে কানে যাওয়া মাত্রই ভয়ে মাথার মধ্যে শিরশির করে ওঠে।



চমকে উঠে সকলে পিছনে তাকালো, দেখে ঃ পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট পুরুষ, সকলের মাথা ছাপিয়ে তার মাথা উপরে উঠেছে—সাধারণ মানুষের প্রায় ডবল উঁচু হবে। রাত্রির অন্ধকারে সেই বিরাট পুরুষের কপালটা যেন জলজল করে জলছে।

মানুষ যে এতো লম্বা হতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সাতজনেই তো হতবুদ্ধি হয়ে গেল। যে-ক'জন মোটর হতে তখনও নাবে নি, তারা নাবতে ভুলে গেল, যারা মুখ ফিরিয়ে দেখছিল, তারা মুখ ফিরিয়ে নিতেও ভুলে গেল—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে পম্পিয়াই সহরের নাগরিকেরা যেমন বিমূঢ়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল এও যেন তেমনিই।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। সেই মুহূর্তগুলি ভূমিকম্পের চেয়ে ভয়াবহ, অগ্ন্যুৎপাতের চেয়েও ভীষণ, ইলেকট্রিকের শকের চেয়েও রোমাঞ্চকর, জলে-ডুবে মরার চেয়েও ব্যাকুল, ছুরির আঘাতে হৃদপিণ্ড ভেদ হয়ে যাওয়ার চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক, গলায় ফাঁসী দেওয়ার চেয়েও আতঙ্কময়।

—Ghost ! ghost !! জিন্ !!!

মোটরের ভিতরে একজন সার্জেণ্টের চীৎকারে সকলের বিমূঢ়তা টুটে গেল, তা যাক্, কিন্তু অতবড় মানুষটীকে সত্যসত্যই চোখের সামনে দেখে ভয় যেন তাদের পেয়ে বসলো। সাহস করে কেউ একটী কথাও বলতে পারলো না, পালাবার জন্য পিছনে এক-পা বাড়াতেও কারও ভরসা হোল না।

ডেভিড আবার সকলের চেয়ে একটু বেশী দুঃসাহসী, অসংখ্য বিপদ তার উপস্থিতবুদ্ধি বাড়িয়ে দিয়েছে। কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটী টেনে বাহির করে বিরাট পুরুষের দিকে তুলে ধরলো। কিন্তু আঙ্গুলের ছোঁয়া লেগে পিস্তলের মুখ দিয়ে আগুন বেরুবার আগেই বজ্রকণ্ঠে সেই বিরাট পুরুষ আদেশ করলো—তিষ্ঠ !

ডেভিডের হাতখানি যেভাবে ছিল রয়ে গেল, যেন কেউ তার পিস্তলশুদ্ধ হাতখানি যীশুর মত ক্রুশবিদ্ধ করে দিয়াছে, উপরেও ওঠে না, নীচেও নামে না।

বিরাট পুরুষ এবার অট্টহাসি হেসে উঠলো—হাহা—হাহা !

সাতটী লোকের দৈহিক শক্তিকে উপহাস করে বিরাট পুরুষ হেসে উঠলো, সে হাসি সাতটী যোয়ান লোকের বুকের মধ্যে হিমেল ঝড় বহিয়ে দিল, যেন উত্তর মেরুর তুষারবাহী ধারালো বাতাসের একটি ঝাপ্‌টা তাদের দেহকে ছুঁয়ে গেল। সেই ঝড়ের ঠাণ্ডায় সাতটি লোক যেন জমে বরফ হয়ে গেল। দেখবার মত দৃষ্টি, বুঝবার মত বুদ্ধি, বিচার করার মত মন, সব থেকেও তারা হয়ে গেল শক্তিহীন, অহল্যার মত পষাণ।

—এসো—!! —সহসা বিরাট পুরুষের আদেশ শোনা গেল।

কথাটী কানে যেতে যতটুকু দেরী। যারা মোটরের ভিতরে ছিল তারা

নেবে এল, যারা বাহিরে থমকে দাঁড়িয়েছিল, তারাও পা বাড়ালো। সবাই যেন এক একটি ইস্‌প্রিংয়ের পুতুল, দু' পায়ে দম্ দেওয়া হয়েছে,—কারও যেতে ইচ্ছা নেই, কিন্তু পা ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ জুলুম করে না, বেঁধে কেউ টানেও না, তবু পা দু'খানিকে থামিয়ে রাখার উপায় নেই, বিরাট পুরুষ চুম্বক পাথরের মত তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

—সতেরো—

রাতের অন্ধকারের পানে উদাস দৃষ্টি মেলে বিনয়বাবু বসে বসে ভাবছেন। মুখখানি বড়ই বিমর্ষ। এ তার কি অবস্থা হোল। কোথায় কার হাতে এসে পড়লেন, পরেই বা কি হবে কে জানে। সেই মোটর য়্যাক্‌সিডেণ্টে সরোজ হয়তো মরে গেছে। পথের উপর হতে পুলিশ সরোজের মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেছে। বন্ধুর মৃতদেহ সনাক্ত করে ডেভিড শোকে মুহ্যমান। সনির মনেও হয়তো এতটুকু শান্তি নাই। এখন সে কোথায় বন্ধুর দুঃখে সান্ত্বনা দেবে, তা নয়, কলিকাতার বাহিরে কোথাকার এত অজ্ঞাত পল্লীর একটি অজানা বাড়ীর অন্ধকার ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে।······

—বিনয়বাবু!

বিনয়বাবু চমকে উঠলেন, দুশ্চিন্তার সূতা ছিঁড়ে গেল। পিছু ফিরে দেখলেন ডাক্তার তার পিছনে দাঁড়িয়ে হেসে তাকে অভিবাদন করছে। লোকটি কখন্ যে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছে, বিনয়বাবু এতটুকু টের পাননি।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো—আপনি তৈরী ?

—কেন, কিসের জন্যে ?

—কিসের জন্যে মানে, আপনি কি এর মধ্যেই সব ভুলে গেলেন নাকি ?

—ওঃ, আপনার সেই সকাল বেলার কথা ?

—হ্যাঁ, সেটা শুধু কথা নয়, সেটা কাজ !

—কিন্তু······

—'কিন্তু' নয়, আপনাকে ডাকাতি করতে হবে।- ভ্রূ দুটী কুঁচকে ডাক্তার বেশ জোর দিয়ে কথাগুলি বললো।

—যদি বলি আমি ডাকাতি করতে পারবো না ?

—সে বলার কি মূল্য আছে! আমি আপনাকে ধরে এনেছি আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তা সে ব্যাঙ্ক থেকেই হোক্ আর ডাকাতি করেই হোক্ টাকা আমায় কিছু দিতেই হবে।

—আমি পারবো না—বিনয়বাবু বেশ জোর দিয়ে কথাটা বললেন।

—পারবেন না! বেশ, কিন্তু এই না-পারার মানে আপনি জানেন না, সেই মানেটা আজ রাত্রেই—আজ রাত্রেই বা কেন, এখনি আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেব। আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

ডাক্তার উত্তেজিত ভাবে বিনয়বাবুর হাত ধরে ঘরের বাহির হয়ে এল, চলতে চলতে বললো—পারব না বললেই আমি আপনাকে ছেড়ে দেব, সেকথা মনেও স্থান দেবেন না, একাজে নাহয় আরেক কাজে আমি আপনাকে লাগাবো, সেই কাজই আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এখনি—

ডাক্তার তরতর করে নীচে নেবে এল। নীচে এতটুকু আলোর রেশ নেই। সেই অন্ধকারের বুকেই তাড়াতাড়ি কয়েকটা ঘর ঘুরে শেষে একটা ঘরের দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালো, অন্ধকারে কি করলো কিছুই বোঝা গেল না, কিন্তু সামনের দেয়ালটি ঘট্ করে একটা শব্দ করে সরে গেল, ভিতরের একটি ঘর হতে তীব্র নীল আলোর ঝলক বাইরে এসে পড়লো। বিনয়বাবুকে নিয়ে ডাক্তার ভিতরে ঢুকে গিয়ে আবার দেয়ালটা বন্ধ করে দিলেন।

শান্ত নীল আলোয় ঘরখানি ঝল্‌মল্ করছে, খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে ঘুম পায়, চোখে স্বপ্নের মায়া লাগে।

ঘরটিতে ঢুকে বিনয়বাবুর প্রথমেই নজরে পড়লো আলমারীর মধ্যে অসংখ্য ওষুধ-পত্র, আর বাহিরের একটা টেবিলের উপর কতকগুলি যন্ত্রপাতি, ঘরখানিকে প্রথম দৃষ্টিতেই একটা ল্যাবরেটরী বলে মনে হয়।

বিনয়বাবুকে সেইখানে রেখে ডাক্তার ওপারের একটা দরজা দিয়ে কোথায় চলে গেল। আধমিনিটের মধ্যে ফিরে এল, কিন্তু একা ফিরলো না, ফিরলো দুটী লোককে সঙ্গে নিয়ে। লোক-দুটীর মুখের পানে বিনয়বাবু চাইলেন। একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বিনয়বাবু চমকে উঠলেন, সরোজেরও বিনয়বাবুকে চিনতে এতটুকু দেরী হোল না। দু'জনেরই ঠোঁট কেঁপে উঠলো, মনের কোণে অনেক দিনের জমে-থাকা কথাগুলি বলার ইচ্ছায়।

ডাক্তারের ধারালো চোখের দৃষ্টি পরস্পরের কেঁপে-ওঠা ঠোঁটের ভাষা বুঝলো,

হেসে কঠিন স্বরে বললো—আপনারা এখানে কথা বলবেন না। গল্প করার জন্য আমি আপনাদের এখানে আনিনি।

সরোজ প্রশ্ন করলো—আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কিজন্য আপনি আমাদের এখানে ধরে এনেছেন ?

—আপনাদের আমি ধরে এনেছি আমার স্বার্থের জন্য—ঠিক আমার স্বার্থ নয়, ভারতের,—শুধু ভারতের কেন,—জগতের অসংখ্য জনসাধারণের জন্য আমি একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট করছি। আপনাদের সহযোগিতায় সেই এক্স্‌পেরিমেণ্ট সার্থক হবে, আর আপনাদের সেজন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে—

সরোজের পাশে রহমৎ দাঁড়িয়েছিল, সে এবার কথা বললো, বললো —তার মানে আমাদের মরতে হবে! তাই না ?

—হ্যাঁ তাই, আপনাদের মরতে হবে। বিশ্বের কল্যাণ কামনায়, অসংখ্য মানুষকে ভবিষ্যৎ অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আপনাদের মত জন-কয়েককে মরতে তো হবেই।

—অর্থাৎ আপনি আমাদের খুন করতে চান ?—বিনয়বাবু বললেন।

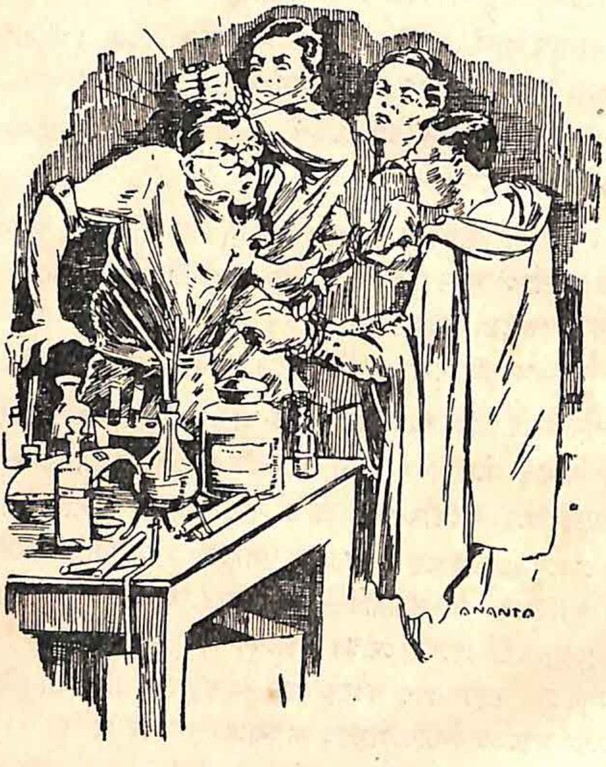
—খুন করাই যদি আপনারা বলতে চান, তা' আপনাদের যা খুসী বলতে পারেন, আমার মতে কিন্তু সেটা আপনাদের বরণীয় মৃত্যু, আদর্শ মৃত্যু, দশের জন্য দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ! প্রতি বছর জগতের অসংখ্য লোক অকালে মরণের কোলে ঢলে পড়ছে শুধু সাপের কামড়ের জন্য, আমি তাদের বাঁচাবো, আমার আবিষ্কার ভারতবাসীর—বিশেষ করে বাঙ্গালীর আবিষ্কার হিসাবে বিশ্বের বুকে বাংলা দেশের গৌরব বাড়াবে। সেই মহৎ প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য আপনাদের মৃত্যু বরণ করতে হবে—এ মৃত্যুকে আমি ত্যাগ বলবো, এটুকু আত্মোৎসর্গ জগতের কল্যাণ কামনায় আপনাদের করতেই হবে!

— অর্থাৎ, আপনি করতে বাধ্য করবেন!

—নিশ্চয়ই, জাতির সুনামের জন্য এটুকু করতেই হবে, জার্মান যুদ্ধে বেলজিয়ানরা সব মরলো, তবু তারা দেশের মান খোয়ালো না, হাব্‌সী যোয়ানেরা গ্যাসের ধোঁয়ায় বেঘোরে প্রাণ দিল, তবু দেশের মাটিতে মুসোলিনীকে কুর্ণিশ করলো না, আর আপনারা দেশকে বড় করার জন্য যতদিন জীবন দিতে না চান, আমি হিটলারের-মতই আপনাদের বাধ্য করবো জীবন দেবার জন্য।

সরোজ হেসে উঠলো, বললো—বেশ চমৎকার যুক্তি, বেড়াল মাছ খায়, তো কুকুর ব্যাঙ্ খাবে না কেন? বেশ!

ডাক্তার একবার ক্রুদ্ধ চোখে সরোজের মুখের পানে তাকালো, সে দৃষ্টিতে ভয় পাবারই কথা, তবে অনেকবারই অনেক লোক সরোজের পানে অমন ভাবে চেয়েছে, ও-দৃষ্টি সরোজের গা-সহা হয়ে গেছে।



—থাক্, আপনাদের সঙ্গে অনর্থক আমি তর্ক করতে চাই না, কে প্রথম আত্মোৎসর্গ করবেন আপনারা নিজেরাই তা ঠিক করে নিন্—আমি আপনাদের পাঁচ মিনিট সময় দিলুম।

বিনয়বাবু বললেন—আমরা যদি কেউই আত্মোৎসর্গ করতে রাজী না হই?

—তা হয় না, আপনাদের একজনকে রাজী হতেই হবে।

—অর্থাৎ একজনকে আপনি জোর করে খুন করবেন?

—হাঁ, আমি তাই করবো, আপনার যখন সেই মত তখন আপনার উপরেই আমার এক্স্পেরিমেণ্ট প্রথম হবে—আপনাকেই আমি প্রথম বেছে নিলাম।

ডাক্তার বিনয়বাবুর হাত ধরে টানলো।

—কী !—সরোজের দু'হাত বাঁধা ছিল, একলাফে এগিয়ে গিয়ে বাঁধা হাত দুটী একসঙ্গে মুঠো পাকিয়ে ডাক্তারের মাথার উপর সবেগে আঘাত করলো।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ সরে গেল, সরোজের হাত ডাক্তারের গায়েই লাগলো না।

ঘরটী পরমুহূর্তেই অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার ঘরের কালো বুক কাঁপিয়ে একটী অট্টহাসি সারা ঘরখানি মুখরিত করে তুললো। সরোজকে উপহাস করে ডাক্তার হাসলো।

—বিনয় ডাক্তার ! বিনয় ডাক্তার !!

—হুম্—হুম্—হুম্ !!!

ল্যাবরেটারীর বাইরের দেওয়ালে আঘাত করে কাকে ডাকতে শোনা গেল।

তখনই সেই ঘর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল, ডাক্তার দেয়ালের ধারে গিয়ে দরজাটী খুলে দিয়ে ডাকলো—আসুন—!

পরমুহূর্তেই যে লোকটী ঘরে এসে ঢুকলো, খুব কম হলেও লোকটী প্রায় দশ-বারো ফুট লম্বা হবে। লোকটীকে আরব্য-উপন্যাসের একটী দৈত্য বললে ভুল হয় না, রামায়ণের একটী রাক্ষস যেন দলছাড়া হয়ে ছিট্‌কে সেখানে এসে পড়েছে। মাথার চুলগুলি জট্ পাকিয়ে কোমরের নীচে এসে পড়েছে। চোখ দুটী লাল, দেখলে ভক্তি না হোক, ভয় হবেই।

সরোজ, রহমৎ ও বিনয়বাবুর পানে তাকিয়ে বিরাট পুরুষ জিজ্ঞাসা করলো—এই তিনটীই কি আজকের একস্পেরিমেণ্টের জন্য ?

—না, ঠিক তা নয়, একজন তো নিশ্চয়ই, দরকার হলে দু'জনই যথেষ্ট।

—বেশ, আমি আরো সাতটীকে এনেছি—

—একেবারে সাতটী ?

—মন্দ কি, তোমার কাজও তো অনেকদূর এগিয়েছে, আর দু'পাঁচটী একস্পেরিমেণ্ট করার পর তুমি বোধ হয় সফল হবে, আমারও আটানব্বুই হয়েছে, আর এই তোমার তিনটী আর আমার সাতটী হইলেই একশো আট—এবার মারে কে ! আমার সাধনা এতদিনে সফল হোল। মা মা, করাল বদনা বিকট-দশনা মা—মা !!

তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সেই ডাক ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা লেগে যেন গম্‌গম্

করতে লাগলো, সে স্বরের তীক্ষ্ণতায় সকলের বুক ক্ষণেকের জন্য কেঁপে উঠলো যেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো,—আপনার লোকেরা কোথায়?

—এই যে, ভিতরে এসো –

বিরাট পুরুষের আদেশে সনি, ডেভিড, রবি ও বাকী চারজন সার্জেণ্ট যন্ত্র-চালিতের মত সরোজ, রহমৎ ও বিনয়বাবুর পাশে এসে দাঁড়ালো।

ডাক্তার নবাগত লোকগুলির মুখের পানে একবার ভাল করে দেখে নিল, তারপর বললো—মহারাজ, আপনি তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্স্পেরি-মেণ্ট করি—

—বেশ!—বিরাট-দেহী সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল।

আলোগুলি নিভিয়া ঘরখানি আবার অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ওপাশের একটী কাচের টেবিলের নীচে একটী আলো জ্বলে উঠলো, সেই আলোয় টেবিলের পালিশ-করা কাচখানি ঝিল্‌মিল্ করতে লাগলো, টেবিলের একধারে রঙীণ ওষুধের শিশিগুলিতে সেই আলোর রঙ একটী রামধনু সৃষ্টি করলো।

ডাক্তার সরোজের হাত ধরে বললো—আসুন, আপনিই প্রথম –

—যদি না যাই?

—যাবেন না!—হেসে ডাক্তার পায়ে করে মেঝের উপর কি একটী টিপে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মেঝেতে চিক্‌মিক্ করে বিদ্যুৎ খেলে গেল, সেই 'শকে' সরোজের আপাদমস্তক বার বার শিউরে উঠলো। শুধু সরোজই নয় সকলেরই ওই একই অবস্থা। ডাক্তার হেসে বললো—সরোজবাবু এবার আসুন—

ইলেক্‌ট্রিকের প্রচণ্ড শক্ তখনও সরোজের মাথার মধ্যে চিন্‌চিন্ করছে, দুঃসাহসী সরোজকে ভীরু, দুর্বল, ব্যথিত করে তুলেছে, আর রুখে দাঁড়াবার সাহস হোল না, ভয়-পাওয়া ভালমানুষ ছোট ছেলেটীর মত সরোজ টুক্‌টুক্ করে ডাক্তারের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো।

ডাক্তার হাসলো। টেবিলের ওধারে একটী কাচের বাক্স বসানো ছিল তার সামনে গিয়ে ডাক্তার দাঁড়ালো, এপাশে ওপাশে বাক্সটীর গায়ে কাচের উপর কয়েকটী চাপড় মারলো। একটী কেউটে সাপ কুণ্ডলী পাকিয়া বাক্সটীর মধ্যে পড়েছিল, চাপড় মারার শব্দে সে সজাগ হয়ে উঠলো, তারপর মাথাটা তুলে চক্র ধরে দুলতে লাগলো। ডাক্তার একটী করে চাপড় মারে আর সে ভিতরে কাচের গায়েই ছোবল মারে,

কাচের আঘাতে মুখে ব্যথা পায়, আর রাগে চক্রটী আরও চওড়া হতে থাকে, মাথা তুলতে থাকে।

ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে সকলে ডাক্তারের কাণ্ড দেখছিল, মুখে কারও কথা নেই!



সেই কাচের বাক্সের ডালাটী খুলে ডাক্তার সাপটীকে বাহির করতে যাবে, এমন সময় সেই অন্ধকার ঘরের বুকে পরিষ্কার ইংরাজীতে কে বলে উঠল—ডক্টর, **your research is not yet perfect. you are simply killing men by the name of medicinal experiments.**

সহসা ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালো, জিজ্ঞাসা করলো—কে?

সে কথার কোনও জবাব পাওয়া গেল না, যে কথা বলছিল, সেই আবার বলে

উঠলো—and I dare say your theory will never attain success !

—কে? কে তুমি! আমি শুধু নরহত্যা করছি? কে তুমি?—টক্‌টক্ করে ঘর-ময় কয়েকটি নীল আলো জ্বলে উঠলো, সাপের বাক্স ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার সকলের সামনে এসে দাঁড়ালো, বললো—তুমি যেই হও না কেন, আমার রিসার্চের একটা প্রমাণ আমি তোমায় দিচ্ছি, যা এর আগে জগতের কোন ডাক্তার আবিষ্কার করতে পারে নি আমি তা করেছি, ওই দেখ—(ডাক্তার সেই দীর্ঘ-দেহী বিরাট পুরুষটীকে দেখালো) আমার একটী ইঞ্জেক্‌সনে পাঁচ ফুট লম্বা লোক দশ ফুট হয়েছে, ওই ইঞ্জেক্‌সনে বাঙালী জাতকে আমি নতুন জীবন দেব, জগতের বুকে ভেতো বাঙালীর দুর্বল নাম ঘুচে যাবে—তারপর এই সাপের ওষুধ, এই দুটো বিষয় ……

—এর একটাও তো তোমার নিজস্ব নয় ডাক্তার, ও তো আরেকজনের রিসার্চ, তুমি নিজের বলে গর্ব করছো !

এবার সকলে দেখতে পেল যে কথা বলছে, সে রহমৎ !

—আরেকজনের রিসার্চ।

—হাঁ। তার নাম ডাক্তার বিনয় রায়। সাপের বিষের ওষুধ বা'র করার জন্য সে লোকটী বাঙলার অনেক জায়গা ঘুরে চট্টগ্রামের দিকে এক তান্ত্রিকের দেখা পায়। সে সাপের বিষের একটা ওষুধ তাকে দেবে বলে, কিন্তু একটী সর্তে, সেই ওষুধের বদলে, তার দেহ যেভাবেই হোক অন্ততঃ দ্বিগুণ করে দিতে হবে,—একটা বিরাট দৈত্যের মত, সাধারণ লোকে যাতে তার যোগবলে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, তার চেহারা দেখে অন্ততঃ ভয় পায়। বিনয় ডাক্তার ক'দিন ধরে অনেক ভেবে-চিন্তে বিচার করে তার থাইরয়েড্ গ্লাণ্ডে একটী ইঞ্জেক্‌সন্ করে। থাইরয়েড্ গ্লাণ্ড থেকেই মানুষের দেহ বাড়ে, সেই গ্লাণ্ডটী যদি ওষুধের জোরে দ্বিগুণ কার্যক্ষম করে তোলা যায়, তাহলে দেহটীও দ্বিগুণ বড় হবে। এই বিষয়ে তাকে আরেকজন ডাক্তার সাহায্য করে, তার নাম বিপিনবাবু। দু'জনের মধ্যে বোঝাপাড়া ছিল যে, যদি সত্যই সর্পাঘাতের ওষুধ ওই তান্ত্রিকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তাহলে আবিষ্কারক হিসাবে দু'জনেরই নাম দেওয়া হবে! কিন্তু বিপিন শেষে বিনয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে! থাইরয়েড্ ইঞ্জেক্‌সনে উপকার পেয়ে তান্ত্রিক যখন ঔষধটী দেবে বললে, তখন একাই সুনাম পাবার জন্য

বিপিন এক রাত্রে বিনয়ের ঘর জ্বালিয়ে দিলে। কোনরকমে আগুনের মধ্যে থেকে বেঁচে গেলেও, সেই শকে তাকে একমাস হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছিল। তারপর সেরে উঠে যখন সে বিপিনের খোঁজ করলে, শুনলে সে কলকাতায় চলে গেছে। বিনয়ও কলকাতায় ফিরে এল। নিজের বাড়ীতে এসে দেখে বিপিন সেখানে বিনয় সেজে বেশ আসর জমিয়ে তুলেছে। তখন এক মুসলমান চাকর সেজে সে বিপিনের কাছে চাকরী নেয়। ক'দিন সেখানে কাজ করার পর বিপিন ডাক্তারের সব সন্ধানই সে পায়। শেষে বিপিনকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় সে পালিয়ে যায়, সাক্ষী যোগাড় করে ; কিন্তু শেষে বিপিন ডাক্তার সুযোগ পেয়ে একদিন পাতাল ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে ; এক পুরাণো আর্টিষ্ট বন্ধু সে যাত্রা তাকে বাঁচায়। তারপর যখন সে বিপিন ডাক্তারকে ধরিয়ে দেবার সব ঠিক করেছে, সেই সময় একটু অসাবধান হওয়ার জন্য বিপিন ডাক্তার তাকে ধরে নিয়ে আসে—

রহমৎ সহসা থেমে ডাক্তারের মুখের পানে ধারালো চোখে চাইল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো—তারপর ?

—তারপর বিপিন ডাক্তারের ল্যাবরেটরীর মধ্যে বিনয় ডাক্তার মুখোমুখী এসে দাঁড়ালো।

—তার মানে ?

—তার মানে আমি সেই বিনয় ডাক্তার, তোমার সাম্নে দাঁড়িয়ে কথা বলছি—

এক সেকেণ্ডে যেন ডাক্তারের মুখের সব রক্ত ব্লটিং পেপারে শুষে নিল, হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হবার সময় বোধ হয় শিবের মুখখানিও ওই রকম পাঙাশ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার রহমতের মুখের পানে কতক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেহে থেকে বলে উঠলো—তু-তুমি সে-এ-ই লোক ?

ডাক্তারের কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল।

—হ্যাঁ, আমিই সেই লোক, সেই চট্টগ্রামের বিনয় ডাক্তার, যার থাইরয়েড্ ইঞ্জেক্সন্ তুমি নিজের বলে চালাতে চাও—সে-ই আমি—

ডাক্তার এবার হিহি করে হেসে উঠলো, এ সেই হাসি, যে-হাসি হেসে পরাজিত নেপোলিয়ন বন্দী হয়ে ইংরাজের জাহাজে গিয়ে উঠেছিল। সে হাসিতে লোকটীকে পাগল মনে করে ভয় পাবারই কথা। হাসি থামিয়ে সহসা সে বললো—

তাই নাকি, বেশ! বেশ!! তোমার দুঃসাহস আছে রহমৎ, কিন্তু, পরিচয়টা এখানে না দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হোত—না হলে আমারই ল্যাবরেটরীতে—

রহমৎ বাধা দিয়ে গর্জে উঠলো—তাই নাকি, তোমার বাড়ী বলে তোমায় ভয় করে চলতে হবে নাকি? বেশ, তোমার এই ল্যাবরেটরীর মধ্যেই আমি তোমায় গ্রেপ্তার করছি—বলেই রহমৎ একটা পিস্তল ডাক্তারের দিকে বাগিয়ে ধরলো, পিস্তলটা ডেভিডের, কখন যে সেটি রহমৎ টেনে নিয়েছে ডেভিড্ জানে না।

—বটে, হা-হা-হাঃ! আগুন নিয়ে খেলবে বন্ধু, আর একটু হাত পোড়াবে না!—বলে ডাক্তার অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে কাচের বাক্সটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, এক লহমার মধ্যে বাক্সটা খুলে সাপটাকে ধরলো, তারপর সাপটিকে একেবারে রহমতের দিকে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সব ক'টি আলোও নিভিয়ে দিয়ে ঘরখানিকে অন্ধকার করে ফেললো।

অন্ধকারের বুকে তৎক্ষণাৎ রহমতের হাতের পিস্তল দুম্ দুম্ করে গর্জে উঠলো।

আর্তনাদে ঘরখানি মুখর হয়ে উঠলো।—

—সাপ্! সাপ!! সাপ!!!

—আমায় কামড়েছে সরোজদা—

—হা—হাঃ, বিনয় ডাক্তার—!

—সাপ!

—সনি! স—নি!!

অন্ধকারে হট্টগোল বেধে যেত, কিন্তু তখনই আবার আলো জ্বলে উঠলো। সেই আলোয় দেখা গেল; সনির একখানি পা জড়িয়ে ধরে মস্তবড় একটা সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ করে মাথা দোলাচ্ছে—সনি পড়ে গেছে। ওদিকে ডাক্তারও টেবিলে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার মুখ যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। আর সেই বিরাট পুরুষটা রহমৎকে ফেলে দিয়ে তার হাত হতে পিস্তলটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

স্তব্ধ-হয়ে-দাঁড়িয়ে-থাকা অতগুলি লোকের মধ্যে এক নিমেষে যেন চেতনা

ফিরে এল। সরোজ ছুটে গিয়ে সাপটার মুণ্ড চেপে ধরলো। কিন্তু তার আগেই সনিকে সে ছোবল মেরেছে।

ডেভিড ছুটে গেল রহমৎকে বাঁচাতে। মহারাজের কাছে যেতে-না যেতেই, এক হাতের ঝট্‌কায় সে ডেভিডকে ফেলে দিল, পড়ে গিয়ে ডেভিড্ কোমর থেকে ভোজালীখানি টেনে নিয়ে আবার তার পানে আগিয়ে যেতেই, মহারাজ রহমৎকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, হাত নেড়ে বললো—তিষ্ঠ!

ডেভিড যেখানে ছিল সেখাকেই দাঁড়িয়ে রইল, বিরাট পুরুষ ধীরে ধীরে ঘর হতে বাহির হয়ে গেল। সে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই ডেভিড সঙ্গীদের আদেশ দিল— পাক্‌ড়ো উস্‌কো—

ডেভিড নিজেও ছুটে বাহিরে যাচ্ছিল, রহমৎ তার হাত ধরে থামালো, বললো—কোন লাভ হবে না সাহেব, রাত্রির অন্ধকারে তাকে ধরা মুস্কিল হবে, তার উপর সে হিপ্‌নোটিজ্‌ম্ জানে, তার চেয়ে ওই শয়তানকে ধরো—বলে ডাক্তারকে দেখিয়ে দিল।

রহমতের কথা শুনে ডাক্তার হি-হি করে হেসে উঠলো, তার পা ভেদ করে পিস্তলের গুলি চলে গেছে, রহমতের কথা শুনে সে বলে উঠলো—শয়তানকে ধরে নিয়ে যাবে, হা-হা; তোমাদের ফাঁকী দেবার দাওয়াই আমার কাছেই আছে! পটাসিয়াম সাইয়ানাইড্, বুঝলে বন্ধু পটাসিয়াম সাইয়ানাইড্—এক সেকেণ্ডে খতম, হা-হাঃ!

সাপটাকে মেরে বিনয়বাবু ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলেন, বললেন—পারমাঙ্গানেট্ অব পটাশ্ আছে, ডাক্তার? পটাশ্ পারমাঙ্গানেট্?

ডাক্তার হি-হি করে আরেকবার তার নিষ্ঠুর হাসি হেসে উঠলো, বললো—ও কেউটে সাপের বিষ বন্ধু, কোন পটাশেই কিছু হবে না, ওর কোন দাওয়াই আজও বেরোয় নি।—

বিনয়বাবু একবার তাড়াতাড়ি টেবিলের উপরে ওষুধের বোতলগুলির দিকে ছুটে গেলেন, কিন্তু কোন বোতলের গায়েই কিছু লেখা নেই, রঙ দেখে তো চেনা যায় না, ভাল করতে গিয়ে খারাপ হয়ে যাবে।

সরোজ সনির পায়ে কাপড়ের বেড় বাঁধলো। সেদিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললো, কিছুতেই কিছু হবে না বন্ধু, ওকে আমি আমার সঙ্গেই নিয়ে যাবো, একা একাই যাবো নাকি, হা-হাঃ!

হাতের আংটীটী ডাক্তার মুখের মধ্যে ভরে দিল। সেকেণ্ডের মধ্যেই ডাক্তার একবার একটু বেঁকেই নিশ্চল হয়ে মাটীর উপর লুটিয়ে পড়লো।

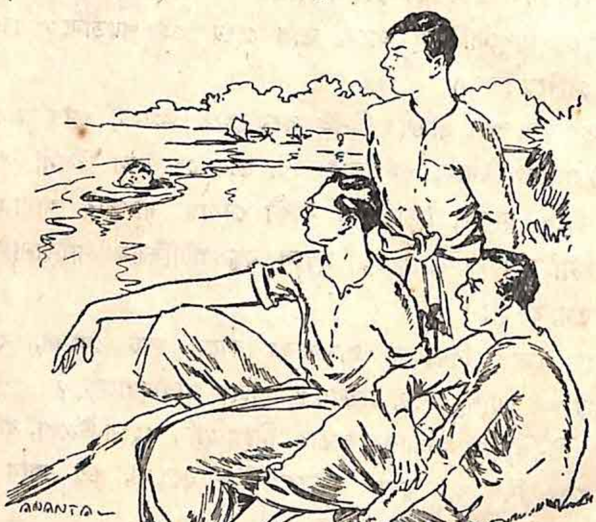
সনির মুখ দিয়ে ততক্ষণে ফেণা উঠতে স্বরু করেছে।

—আঠারো—

তারপর অনেকক্ষণ অনেক চেষ্টাই চললো, কিন্তু কাল-কেউটের বিষ একবার যার দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, তার বেঁচে ওঠাই বিস্ময়।

সনিও সে যাত্রা বাঁচলো না।

সর্পাহত দেহ দাহ করতে নেই ; নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে তিনবন্ধু শোকাচ্ছন্ন চোখে জলস্রোতের পানে চেয়ে রইলো। সনির নীল বিষাক্ত দেহটী ধীরে ধীরে ভাসতে ভাসতে ঢেউয়ের বুকে নেচে নেচে দৃষ্টির সীমা পার হয়ে গেল।



বিনয়বাবু আকাশের পানে তাকিয়ে দু'হাত বুকের উপর চেপে ধরে বিড় বিড় করে বলে উঠলেন—শক্তি দাও ভগবান, সহ্য করার মত শক্তি দাও!

সরোজ ও ডেভিডের চোখের সামনে তখন আকাশ ও মাটী, নদীর জল ও দিগ্বলয় রেখা—সব ঝাপ্‌সা একাকার হয়ে গেছে!

—শেষ—